হিন্দু ধর্ম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম

১

পানি ব্যবহার করে
সাবান দিয়ে ফেনা
তৈরি করতে হবে

২

দুই হাতের পেছন
থেকে আঙুলের ফাঁক
পরিষ্কার করতে হবে

৩

দুই হাতের তালু এবং
আঙুলের ফাঁক পরিষ্কার
করতে হবে

৪

দুই হাতের আঙুল
আলতোভাবে মুঠো করে
ভালোভাবে ঘষতে হবে

৫

দুই হাতের বুড়ো আঙুল
হাতের তালু দিয়ে ঘুরিয়ে
পরিষ্কার করতে হবে

৬

এক হাতের পাঁচ আঙুলের
নখ দিয়ে অন্য হাতের তালু
ভালোভাবে ঘষতে হবে

৭

দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত
ভালোভাবে পরিষ্কার
করতে হবে

৮

হাত ভালোভাবে ধুয়ে
শুকনো পরিষ্কার কাপড় বা
টিস্যু দিয়ে মুছে নিতে হবে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

ড. নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস

ড. তাপস কুমার বিশ্বাস

ড. ময়না তালুকদার

সুবর্ণা সরকার

বিপ্লব মল্লিক

ড. শিশির মল্লিক

পরিমল কুমার মণ্ডল

ড. প্রবীর চন্দ্র রায়

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ২০২২

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ

বিভোল সাহা

শাওন চৌধুরী

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

মঞ্জুর আহমদ

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্যদিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ ও কারিগরি) ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। উল্লেখ্য যে ইতোমধ্যে অর্ন্তবর্তীকালীন ট্রাই-আউটের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহ করে লেখক এবং বিষয় বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে যৌক্তিক মূল্যায়ন করে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জন করা হয়েছে। আশা করা যায় পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকটির মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিষয় পরিচিতি

প্রিয় শিক্ষার্থী

ষষ্ঠ শ্রেণির এই বইয়ে তোমাকে স্বাগতম।

এই বইটি তোমাকে নতুন নতুন কাজের মধ্যদিয়ে কিছু নতুন অভিজ্ঞতা দেবে। তোমরা নিজেদের জীবনে কীভাবে এই অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগাবে, ঈশ্বরের অপার মহিমা জেনে মানবকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করবে সেই বিষয়ের অনেক কথা এই বইয়ে লেখা আছে।

ষষ্ঠ শ্রেণির এই বইটিতে ফিল্ডট্রিপ, ছবি আঁকা, আলপনা দেওয়া, নাটিকা, গান, ভজন, কীর্তন, মন্ডপসজ্জা, কবিতাসহ এরকম আরও অনেক আনন্দময় বিষয় তুমি জানতে পারবে। এসকল বিষয়ের মধ্যদিয়ে বিভিন্ন কাজ তুমি কীভাবে করবে তাই জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

বিভিন্ন শিরোনামে এই বইয়ে হিন্দুধর্মের কিছু মূলকথা তোমাদের জানানো হয়েছে। দেখতে পাবে, বইটার মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি আছে, দেবদেবী এবং অবতারগণের জীবনী এবং খেলার ছলে কিছু কাজ করার কথা বলা হয়েছে।

এই বইয়ের বিষয়বস্তুসমূহ ধর্ম নিয়ে হলেও তা কিন্তু বেশ আনন্দদায়কও। বিষয়গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়লে হিন্দুধর্মের মূল বক্তব্য তুমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে এবং তা অনুসরণ করে সুন্দর জীবন গড়তে পারবে। তোমার মনে আরও কোনো প্রশ্ন এলে সে প্রশ্নগুলো তোমার শিক্ষক, বাবা-মা/অভিভাবক বা বন্ধুকে করতে পার।

তোমার জন্য অনেক ভালোবাসা এবং শুভকামনা। চলো আমরা আনন্দের মধ্যদিয়ে, কাজের মধ্যদিয়ে, অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যদিয়ে হিন্দুধর্মের ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য যোগ্যতাগুলো অর্জন করি।

হিন্দুধর্ম শিক্ষা তোমার জন্য অনেক আনন্দের হোক, এই কামনা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বরে বিশ্বাস ১ - ৯

ঈশ্বরের স্বরূপ–নিরাকার ও সাকার ১০ - ২০

আত্মার অবিনাশিতা, জন্মান্তর ও কর্মফল ২১ - ২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিত্যকর্ম ২৪ - ২৮

শুচিতা, উপাসনা, প্রার্থনা, পূজা, পার্বণ, মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র ২৯ - ৩১

শুচিতা ৩২ - ৩৩

উপাসনা ও প্রার্থনা ৩৪ - ৩৬

স্তব-স্তুতি ও প্রার্থনামূলক কবিতা ৩৭ - ৩৯

দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ ৪০ - ৪৮

মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র ৪৯ - ৫৩

যোগাসন ৫৪ - ৫৭

তৃতীয় অধ্যায়

মানবিক গুণ– নৈতিকতা, মানবিকতা, সহমর্মিতা, দায়িত্বশীলতা ৫৮ - ৬৫

আদর্শ জীবনচরিত ৬৬ - ৮০

সহাবস্থান ৮১ - ৯১

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বরে বিশ্বাস

আমাদের চারপাশটা কত সুন্দর! অপরূপ রূপ! যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি ফুল, ফল, ফসল, দিগন্তজোড়া মাঠ, গাছপালা। সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর, যানবাহন আরও কত কী! প্রকৃতি দেখতে আমরা সকলেই ভালোবাসি। আজকে যদি আমরা প্রকৃতি দেখতে বের হই তাহলে কেমন হয়? তাহলে চলো সবাই মিলে আজ প্রকৃতি দেখতে বের হই। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে পরের পৃষ্ঠার ছকটি পূরণ করি এবং শ্রেণিকক্ষে সবার সামনে উপস্থাপন করে মত বিনিময় করি।

প্রকৃতিতে আমরা অনেক ধরনের জিনিস দেখতে পেলাম। এবার নিচের ছকে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এবং মানুষের তৈরি কয়েকটি জিনিসের নাম লিখি এবং শ্রেণিতে তা উপস্থাপন করি।

প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট	মানুষের তৈরি

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

অপূর্ব সুন্দর এই পৃথিবী। এখানে রয়েছে মানুষ, জীবজন্তু, আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র, নদ-নদী, মরুপ্রান্তর ইত্যাদি। এই পৃথিবী বা বিশ্বের মধ্যে আছে নানা বৈচিত্র্য।

এখানে আছে নানা ধরনের প্রাণী। এই সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে পরিচিত। মানুষের এই শ্রেষ্ঠতা তার বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার জন্য। এখন প্রশ্ন হতে পারে, এ সব কিছু কে সৃষ্টি করেছেন? নিশ্চয়ই এর পেছনে একজন স্রষ্টা আছেন। যিনি সর্বশক্তির উৎস, যাঁর উপরে কেউ নেই।

তিনি পরম পিতা, তিনি পরম স্রষ্টা, পরম ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, ভগবান। পরমাত্মা নামেও তিনি পরিচিত। তিনি ঈশ্বর নামেও অভিহিত। তাঁকে দেখা না গেলেও, তিনি সর্বত্র বিরাজিত। ঈশ্বর বা পরমাত্মা জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আমরা তাঁকে অনুভব করি। সৃষ্ট জীবজগতের মধ্য দিয়ে তাঁকে অনুভব করা যায়। সাধকেরা সাধনার মাধ্যমে এবং ভক্তেরা ভক্তির মাধ্যমে তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করে থাকেন।

ঈশ্বরের সৃষ্টি পরিবেশ এবং মানুষের তৈরি বস্তু

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ধরনের মেলা বা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়ে থাকে। ধরি, এরকম একটি মেলার আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে পাশাপাশি দুটি স্টল আছে। একটি স্টলে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট কিছু বস্তু বা বস্তুর ছবি আছে। অন্য স্টলে মানুষের তৈরি কিছু জিনিস বা জিনিসের ছবি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কেউ একজন এগুলো সম্পর্কে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

১ম স্টলের ছবিতে মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, চন্দ্র, সূর্য, পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, সৌরজগৎ ইত্যাদি আছে। পাশের স্টলের একটা ছবিতে টেবিল, চেয়ার, বই-পত্র, ল্যাপটপ ইত্যাদি আছে। প্রথম ছবিটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। দ্বিতীয় ছবিটি মানুষের তৈরি কিছু জিনিসের ছবি। এখন আমরা নিচের এই দুটি ছবির পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করি।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

মানুষের তৈরি পরিবেশ

আমরা জানি, এই মহাবিশ্বের সবকিছু ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। আর এই দৃশ্যমান সৃষ্টিকে আমরা প্রকৃতি বলি। ছবিতে দৃষ্ট প্রাকৃতিক ছবিটিই প্রকৃতি। আমরা এই প্রকৃতির একটা ক্ষুদ্র অংশমাত্র। সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন- মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, চন্দ্র, সূর্য, পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, সৌরজগৎ প্রভৃতি। তিনি এই সৃষ্টি করার সময় কিন্তু কারও কোনো সাহায্য নেননি। অথচ মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টির সহায়তা ছাড়া কোনো কিছুই তৈরি করতে পারে না। অর্থাৎ ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তুর সাহায্যে মানুষ নানা জিনিসপত্র তৈরি করছে। দ্বিতীয় ছবিতে মানুষের তৈরি জিনিস দেখানো হয়েছে।

আমরা যদি আরও একটু পরিষ্কার করে বলি, তাহলে বলা যায় সবকিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। ঈশ্বর চাইলে সব কিছু সৃষ্টি করতে পারেন। মানুষ কিন্তু ঈশ্বরের মতো সব কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। যেমন– ঈশ্বর গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়, সমুদ্র প্রভৃতি সৃষ্টি করতে পারেন। মানুষ তা পারে না। মানুষ প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্রের সাহায্যে রোবট তৈরি করতে পারে। কিন্তু মানুষ সেই রোবটের মধ্যে আত্মাকে প্রবেশ করাতে পারে না। মানুষ প্রকৃতি থেকে সৃষ্ট গাছের কাঠ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে পারে। কিন্তু মানুষ নিজে প্রকৃতি সৃষ্টি করতে পারে না। তাই আমরা বলতে পারি, ঈশ্বরের পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব তা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক

স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসেন, প্রতিপালন করেন। স্রষ্টাকে ছাড়া যেমন সৃষ্টিকে কল্পনা করা যায় না, তেমনি সৃষ্টি ছাড়া স্রষ্টাকেও ভাবা যায় না। উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। স্রষ্টার সৃষ্টি নানাভাবে একে অপরের উপকার করে থাকে। যেমন– ঈশ্বরের সৃষ্টি জল, বায়ু, সূর্য প্রভৃতির কারণে জগতের প্রাণিকুল বেঁচে আছে। এদের কারণেই আমরা নানাবিধ শস্য ও ফসল চাষ করতে পারি, এই ফসল আমাদের খাদ্যের জোগান দেয় এবং আমাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। গাছপালা সূর্যের আলোয় তার খাদ্য প্রস্তুত করে বেড়ে ওঠে। জল ছাড়া কোনো প্রাণীর বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। নদ-নদীর মাধ্যমে আমরা প্রাকৃতিকভাবে জল পেয়ে থাকি। সৃষ্টিকর্তার এই সৃষ্ট সম্পদ মানুষ নানাভাবে ব্যবহার করে। মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে জীবনযাপন করে। সৃষ্টিকর্তার এসব সৃষ্টি ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। আবার অন্য জীবও স্রষ্টার নানা সৃষ্টির ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। প্রত্যেকে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। এভাবে বলা যেতে পারে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক বিরাজমান।

- স্রষ্টা এবং সৃষ্টি সম্পর্কে তোমার ভাবনাগুলো নিচের বক্সে লেখো

বিদ্যালয় থেকে আসার সময় একদিন নকুল রাস্তা থেকে একটি আহত পাখির ছানা নিয়ে বাসায় এলো। বাসায় এনে ছানাটিকে খাবার দেওয়া, আদর করা ইত্যাদি সকল কাজ সে নিজের হাতেই করতে থাকে। আদর এবং সেবা-যত্নে পাখির ছানাটিকে সে সুস্থ করে তোলে। আর পাখির ছানাটিও ভীষণ মজা করত তার সাথে। নকুল বাসায় থাকলে সব সময় তার পিছু নিত। এরপর পাখির ছানাটি একটু বড় হতেই একটু একটু করে উড়তে শিখল। নকুল এবার ছানাটিকে ছেড়ে দিয়ে আসল সেই গাছের তলায়, যেখানে ছানাটি পড়ে ছিল। নকুলের মতো আমাদের জীবনেও অন্যকে সেবা করার এরকম অনেক ঘটনা আছে। এবার আমরা শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক নিচের ছকে আমাদের জীবনের এরকম দুটি বা একটি করে ঘটনার কথা সংক্ষেপে লিখে শ্রেণিতে তা উপস্থাপন করি।

যার সেবা করা হয়েছিল	কী ধরনের সেবা প্রদান করা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান

ঈশ্বর আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাঁরই অংশ। কারণ সৃষ্টিকর্তা হলেন পরমাত্মা। আর আমাদের মধ্যে যে আত্মা বিরাজিত সেই আত্মা পরমাত্মারই অংশ। তাই ব্যাপকার্থে জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ। এখন প্রশ্ন হতে পারে তাহলে মানুষ কেন ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়ায়? সে কেন ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য কঠোর সাধনা করে? এর সহজ উত্তর হলো, ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য সাধনাই যথেষ্ট নয়। তাঁকে পেতে হলে আগে সৃষ্টিকে জানতে হবে। জীবের সেবা করতে হবে। ভালোবাসতে হবে তাঁর সৃষ্টিকে। তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসলেই তিনি খুশি হন। আর তাতেই তিনি ভক্তের প্রতি সদয় হন। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন–

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

এজন্য আমাদের সকল জীবের প্রতি সদয় হতে হবে। সকল জীবকে ভালোবাসতে হবে। তবেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে। এই জীব বলতে প্রধানত বিভিন্ন প্রাণীকে বোঝানো হয়েছে। আমাদের যেমন সকল মানুষকে ভালোবাসতে হবে, তেমনি গৃহপালিত পশুপাখিসহ সকল প্রাণীর যত্ন নিতে হবে। তাদের সেবা করতে হবে। পাশাপাশি বাড়ির চারপাশের গাছপালারও পরিচর্যা করতে হবে। অকারণে আমরা কোনো জীবকে কষ্ট দেবো না। জীব হত্যা করব না। গাছের ডাল ভাঙবো না। গাছ কাটবনা। অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তার সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসতে হবে। তবেই হবে ঈশ্বরকে ভালোবাসা। তবেই হবে প্রকৃতপক্ষে ধর্মপালন।

গৃহপালিত প্রাণীর সেবায় দুই ভাইবোন

দেয়াল পত্রিকা

দেয়াল পত্রিকা হলো বিভিন্ন তথ্যের এক ধরনের নান্দনিক প্রদর্শনী। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে কোনো একটি বিষয় নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা, মতবিনিময়, উপস্থাপনের সাপেক্ষে লেখা, গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া, ছবি ইত্যাদি রচনা এবং নির্বাচন করে। এগুলোই শিক্ষার্থীরা বোর্ডে নিজ হাতে লিখে বা এঁকে আকর্ষণীয় এবং সুপাঠ্য করে অন্য দর্শক বা পাঠকের সামনে তুলে ধরে।

ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যা জানলাম এবং আমাদের পিতামাতা, শিক্ষক এবং গুরুজনদের নিকট থেকে যা জানলাম এবং উপলব্ধি করলাম তার উপর ভিত্তি করে আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের মতো করে করে প্রবন্ধ, ছড়া, কবিতা, গল্প ইত্যাদি লিখব। এসকল বিষয়ের উপর সুন্দর করে ছবিও আঁকতে পারি। নিজেদের লেখা বা আঁকা এসব দিয়ে আমরা সুন্দর একটি দেয়াল পত্রিকা তৈরি করব। দেয়াল পত্রিকাটি আমাদের শ্রেণিকক্ষের সামনে স্থাপন করব যেন সকলে দেখতে পায়।

এবার দেয়াল পত্রিকা করতে যা যা লাগবে তা এক নজরে দেখে নিই। বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে নিজেরাই ঠিক করি একটি দেয়াল পত্রিকা তৈরিতে কী কী প্রয়োজন নিচের ছকে তার তালিকা প্রণয়ন করি। এরপর আমাদের নির্বাচিত লেখাগুলো দিয়ে একটি দৃষ্টিনন্দন দেয়াল পত্রিকা তৈরি করি। দেয়াল পত্রিকা তৈরির সময় সবাই যেন অংশগ্রহণ করি। দলীয় কাজে সবাই পরস্পরকে সহযোগিতা করে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করি।

দেয়াল পত্রিকা তৈরির উপকরণ	

এবার আমাদের নিজের তৈরি তালিকার সাথে নিচের তালিকার সাথে মিলিয়ে দেখি আমাদের সংগ্রহে কী আছে এবং আমাদের আর কী কী সংগ্রহ বা তৈরি করতে হবে।

দেয়াল পত্রিকা তৈরির উপকরণ	
আর্ট পেপার	রচনা/লেখা
পোস্টার পেপার	গদ্য/পদ্য/ছড়া
বোর্ড/কর্কশিট	সুন্দর হস্তাক্ষর
স্ট্যান্ড	ছবি
রং-পেনসিল	দৃষ্টিনন্দন নকশা
বিভিন্ন রঙের কলম	মহাপুরুষের বাণী

■ তুমি যদি কোনো ক্ষুধার্ত মানুষকে দেখ, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে মানুষকে সেবা করার মাধ্যমে তুমি কার সেবা করছ বলে মনে করো? বিষয়টি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে নিচে লেখো।

ঈশ্বরের স্বরূপ
নিরাকার ও সাকার

■ আমরা অনেক দেবদেবীর ছবি ও প্রতিমা দেখি এবং তাঁদের পূজা করি। এবার নিচের ছকে আমার দেখা বিভিন্ন দেবদেবীর নাম লিখি এবং কীসের জন্য পূজা করি তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখি।

ক্রম	দেবদেবীর নাম	কী কারণে পূজা করা হয়
১		
২		
৩		

এবার উপরের তালিকার যে দেবদেবীর পূজা তুমি করে থাক কিংবা যাঁকে তোমার সব থেকে ভালো লাগে নিচে তাঁর ছবি আঁক।

ঈশ্বরের স্বরূপ– নিরাকার ও সাকার

এই যে আমরা বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি আঁকলাম এর প্রতিটিই ঈশ্বরের একেকটি রূপ। ঈশ্বরকে এইভাবে আমরা নানারূপে আরাধনা করে থাকি।

ঈশ্বর নিরাকার, তাই আমরা তাঁকে দেখতে পাই না। তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্যদিয়ে আমরা তাঁকে অনুভব করি। নিরাকার ব্রহ্মরূপে তিনি সর্বত্র বিরাজিত। তিনি জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্ম, যোগীর কাছে পরমাত্মা এবং ভক্তের কাছে ভগবান রূপে পরিচিত। ঈশ্বরকে বলা হয় 'স্বয়ম্ভূ'। কারণ তিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিত্য, শুদ্ধ ও পরম পবিত্র। তিনি সকল কর্মের ফলদাতা। যে যেমন কাজ করে তিনি তাকে সেই কাজ অনুসারে ফল প্রদান করেন। ঈশ্বরের রূপের অন্ত নেই। অনন্তরূপ তাঁর। তিনি সর্বব্যাপী।

কোনো বিশেষ শক্তির প্রকাশ ঘটাতে সাকার রূপে ঈশ্বর পৃথিবীতে আসেন। আবার কোনো জ্ঞানী বা সাধকের ভাবনায় ঈশ্বরের নানা রূপের ধারণা পাওয়া যায়। ঈশ্বরের কোনো বিশেষ গুণ বা শক্তির সাকার রূপ হলো দেবতা বা দেবদেবী। হিন্দুধর্মে বিভিন্ন দেবদেবীর কথা উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া ঈশ্বর আত্মারূপে সকল জীবের মধ্যে অবস্থান করেন।

ঈশ্বর কখনও কখনও প্রয়োজনে জীবদেহ ধারণ করেন এবং পৃথিবীতে আসেন। তাঁর এই আসা বা অবতীর্ণ হওয়াকে বলে অবতার। তিনি অবতীর্ণ হন দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্য। পৃথিবীতে শান্তি এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সাকার রূপ ধারণ করেন। সাকার রূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি নানা কর্মের মধ্যদিয়ে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করেন। তবে নিরাকার এবং সাকার রূপ মূলত সেই এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই ভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

দেবদেবী রূপে নিরাকার ঈশ্বরের সাকার রূপ

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। 'একমেবা অদ্বিতীয়ম্'। অনন্ত তাঁর গুণ ও শক্তি। তাঁর এই গুণ বা শক্তি দেখা যায় না। তবে অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। যেমন– আলো, বাতাস, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি দেখা যায় না। শুধু অস্তিত্ব বা উপস্থিতি অনুভব করা যায়। তেমনি ঈশ্বরকেও দেখা যায় না, অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। তিনি নিরাকার, সর্বশক্তিমান। নিরাকার ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তির সাকার রূপই হচ্ছেন দেবদেবী। অর্থাৎ দেবদেবীরা ঈশ্বরের বিশেষ গুণ বা শক্তিরই মূর্ত প্রকাশ মাত্র। আমরা ঈশ্বরের সাকাররূপী বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করি। যেমন– ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা, বিষ্ণুরূপে ঈশ্বর জীবজগৎকে রক্ষা ও প্রতিপালন করেন, শিবরূপে তিনি ধ্বংস করে পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করেন। বিদ্যাশক্তির সাকার রূপ সরস্বতী দেবী, ধনসম্পদের শক্তির রূপ লক্ষ্মীদেবী, সকল শক্তির সম্মিলিত রূপ দুর্গাদেবী। এই দেবদেবীদের পূজা করার মধ্যদিয়ে আমরা মূলত সেই এক ঈশ্বরেরই পূজা করে থাকি।

■ এখানে সংক্ষেপে কয়েকজন দেবদেবীর পরিচয় দেওয়া হলো–

ব্রহ্মা

ঈশ্বর যে রূপে সকল কিছু সৃষ্টি করেন তাঁর নাম ব্রহ্মা। সুতরাং ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা। ব্রহ্মার চার হাত, চার মুখ। তাঁর বাম দুই হাতে ঘৃতপাত্র ও কমণ্ডলু। ডান দিকের দুই হাতে ঘি ঢালার চামচ ও অক্ষমালা। ব্রহ্মার গায়ের রং লালচে ও উজ্জ্বল। লালপদ্ম তাঁর আসন। হংস তাঁর বাহন। ব্রহ্মা লাল ফুল পছন্দ করেন। তাই ব্রহ্মাপূজায় লাল ফুল দেওয়া হয়।

ব্রহ্মা

বিষ্ণু

বিষ্ণু

এ জগতে যা কিছু আছে বিষ্ণুরূপে তিনি সব প্রতিপালন ও রক্ষা করেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করার নিমিত্তে তিনি বহুরূপে এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। বিষ্ণুর চার হাত। উপরের ডান হাতে চক্র, বাম হাতে শঙ্খ। নিচের ডান হাতে গদা আর বাম হাতে পদ্ম থাকে। চন্দ্রালোকের মতো বিষ্ণুর গায়ের রং। তাঁর বাহন গরুড় পাখি। বিষ্ণুর আরেক নাম নারায়ণ।

শিব

আমাদের মঙ্গলের জন্য শিব সকল অশুভকে ধ্বংস করেন। তিনি ধ্বংস করে জগতের ভারসাম্য রক্ষা করেন। শিবের গায়ের রং তুষারের মতো সাদা। তাঁর তিনটি চোখ, তৃতীয় চোখটি কপালে থাকে। তাঁর মাথায় জটা, জটার উপরে থাকে বাঁকা চাঁদ। হাতে ডমরু ও শিঙ্গা থাকে। সাথে সব সময় ত্রিশূল থাকে। শিব বাঘের চামড়া পরিধান করেন। বৃষ তাঁর বাহন। তাঁর অনেক নাম– মহেশ্বর, মহাদেব, রুদ্র, আশুতোষ, ভোলানাথ, পশুপতি, নটরাজ ইত্যাদি। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে শিবপূজা করা হয়।

শিব

দুর্গা দেবী

দুর্গা দেবী

দুর্গা শক্তির দেবী। সকল শক্তির মিলিত রূপ দুর্গা। জীবের দুর্গতি নাশ করেন বলে তাঁকে দুর্গতিনাশিনীও বলা হয়। দেবী দুর্গার দশ হাত। তাই তাঁর নাম দশভুজা। আরও অনেক নামে তিনি পরিচিত, যেমন – মহামায়া, চণ্ডী, মহালক্ষ্মী, কালী, জদদ্ধাত্রী, কাত্যায়নী, ভগবতী ইত্যাদি। অতসী ফুলের মতো তাঁর গায়ের রং। সিংহ তাঁর বাহন। আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী তিথি পর্যন্ত দুর্গাপূজা করা হয়।

কালী দেবী

কালী দেবী

কালী শক্তির দেবী। তিনি মুক্তকেশী ও মুণ্ডমালা বিভূষিতা। তিনি শ্যামবর্ণা। তাঁর চারটি হাত ও তিনটি চোখ। তাঁর বামপাশের দুই হাতে রয়েছে নরমুণ্ড ও খড়্গ। আর ডান হাতে রয়েছে বর ও অভয় মুদ্রা। দুই হাতে তিনি তাঁর ভক্তদের আশীর্বাদ করেন। ভক্তদের অভয় দান করেন। আর দুই হাতে তিনি অসুর ও দুষ্টদের দমন করেন। তাঁর চরণতলে শুয়ে আছেন শিব।

কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজা হয়। তবে অন্য সময়েও কালীপূজা করা যায়। বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে কালীপূজার প্রচলন বেশি। আমরা শক্তিলাভের জন্য কালীপূজা করব। দুষ্টের দমনের জন্য কালীপূজা করব। আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য কালীপূজা করব।

লক্ষ্মী দেবী

লক্ষ্মী ধন-সম্পদ, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবী। লক্ষ্মী দেবীর গায়ের রং উজ্জ্বল হলুদ। তাঁর বাহন পেঁচা। দেবী লক্ষ্মী শ্রী হিসেবে অভিহিত। কেননা তিনি সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতার প্রতীক। তিনি পদ্মফুলের উপর উপবিষ্ট। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে লক্ষ্মীপূজা করা হয়। একে বলা হয় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। তবে প্রতি বৃহস্পতিবার ঘরে ঘরে পাঁচালি পড়ে লক্ষ্মীপূজা করা হয়।

লক্ষ্মী দেবী

মনসা দেবী

মনসা সর্পের দেবী। তিনি মূলত একজন লৌকিক দেবী। কারণ বৈদিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর মধ্যে তাঁর নাম নেই। আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে মনসা দেবীর পূজা করা হয়। এই তিথিকে নাগপঞ্চমীও বলা হয়। আমাদের দেশে শ্রাবণ মাসের শেষ দিনে অর্থাৎ সংক্রান্তিতে মনসা দেবীর পূজা বেশি দেখা যায়। তিনি হাঁসের উপরে আসীন। তাঁর মাথার উপরে সাপের ফণা রয়েছে। গলদেশে সাপ আছে। তাঁর বাহন হাঁস। তাঁর চার হাত। বাম দুই হাতে আছে লাল পদ্ম এবং সাপ। ডান দিকের এক হাতে আছে সাদা পদ্ম। অন্য হাতে আছে বরাভয়। মনসার অপর নাম বিষহরি বা বিষহরা ও পদ্মাবতী। সর্পদংশনের হাত থেকে রক্ষা পেতে এবং ঐশ্বর্য লাভের জন্য মনসা পূজা করা হয়।

মনসা দেবী

অবতার হিসেবে নিরাকার ঈশ্বরের সাকার রূপ

ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু, তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন। তবে ঈশ্বর কখনও কখনও বিশেষ রূপ ধরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হোন। অনেক সময় তিনি মানুষের মতো দেহধারণ করেন। এই দেহধারণের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। তিনি দেহধারণ করে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন। এ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন –

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৪/৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪/৮

শব্দার্থ: যদা যদা হি– যখন যখনই; ধর্মস্য গ্লানিঃ– ধর্মের অবনতি; ভবতি– হয়; ভারত– হে ভারত (অর্জুন); অভ্যুত্থানম্– বৃদ্ধি; অধর্মস্য– অধর্মের; তদা– তখন; আত্মানং– নিজেকে; সৃজামি– সৃষ্টি করি; অহম্– আমি। পরিত্রাণায়– রক্ষার জন্য; সাধূনাং– সৎ ব্যক্তিদের; বিনাশায়– বিনাশের জন্য; চ– এবং ; দুষ্কৃতাম্– অসৎ বা দুষ্টদের; ধর্মসংস্থাপনার্থায়– ধর্ম সংস্থাপনের জন্য; সম্ভবামি– অবতীর্ণ হই; যুগে যুগে– যুগে যুগে।

সরলার্থ: পৃথিবীতে যখনই ধর্মের অবনতি হয় ও অধর্ম বেড়ে যায়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সৎ ব্যক্তিদের রক্ষা, অসৎ বা দুষ্ট ব্যক্তিদের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

পৃথিবীতে ঈশ্বরের এরূপ অবতরণকে অবতার বলা হয়। তিনি নানারূপে অবতীর্ণ হন। এই অবতারগণ মানুষের এবং জগতের মঙ্গল করেন। বিভিন্ন যুগে ভগবানের বিশেষ দশটি অবতারের কথা বর্ণিত হয়েছে। যথা- মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন সত্যযুগের অবতার। পরশুরাম ও রাম ত্রেতা যুগের অবতার। বলরাম দ্বাপর যুগের অবতার। বুদ্ধ ও কল্কি কলি যুগের অবতার।

■ এখানে সংক্ষেপে চারজন অবতারের পরিচয় দেওয়া হলো–

মৎস্য অবতার

ভগবান বিষ্ণুর প্রথম অবতার হলো মৎস্য অবতার। এই অবতারের শরীরের উপরের অংশ দেখতে মানুষের মতো। নিচের অংশ মাছের মতো। অনেক বছর আগে সত্যব্রত নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে হঠাৎ পৃথিবীতে অনেক দুর্যোগ দেখা দেয়। ধর্মের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। অধর্মের মাত্রা বেড়ে যায়। রাজা তখন ঈশ্বরের করুণা কামনা করেন। একদিন স্নানের সময় রাজা সত্যব্রতের নিকট এসে একটি ছোট পুঁটি মাছ প্রাণ ভিক্ষা চায়। রাজা কমন্ডলুতে করে মাছটিকে বাড়ি নিয়ে এলেন। কিন্তু অবাক কান্ড। মাছটির আকার ক্রমশ বাড়তে থাকে। মাছটিকে পুকুর, নদী কোথাও রাখা যাচ্ছিল না। মাছটি আকারে বাড়তেই থাকে। তখন রাজা ভাবলেন, এটা আসলে মাছ নয়। নিশ্চয়ই ভগবান নারায়ণের কোনো রূপ। রাজা তখন মৎস্যরূপী নারায়ণের স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন। স্তব-স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে মৎস্যরূপী নারায়ণ বললেন, সাত দিনের মধ্যে এ জগতের প্রলয় হবে। সে সময় তোমার ঘাটে একটি স্বর্ণতরী ভিড়বে। তুমি বেদ, সব রকমের জীবদম্পতি, খাদ্যশস্য ও বৃক্ষবীজ সংগ্রহ করে তাদের নিয়ে সেই নৌকায় উঠবে। আমি তখন শৃঙ্গধারী মৎস্যরূপে আবির্ভূত হব। তুমি তোমার নৌকাটি আমার শৃঙ্গের সঙ্গে বেঁধে রাখবে।

মহাপ্রলয় শুরু হলো। মৎস্যরূপী নারায়ণের নির্দেশ অনুসারে রাজা কাজ করলেন। ধ্বংসের হাত থেকে রাজা, তার সঙ্গী-সাথি এবং অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী রক্ষা পেল। এভাবে মৎস্যরূপী ভগবান বিষ্ণু সৃষ্টিকে রক্ষা করলেন। রক্ষা পেল পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদ।

মৎস্য অবতার

কূর্ম অবতার

ভগবান বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার হলো কূর্ম অবতার। একবার অসুরেরা দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য দখল করে নেয়। তখন ব্রহ্মা ও ইন্দ্র পরাজিত দেবতাদের নিয়ে ভগবান বিষ্ণুর কাছে যান এবং তাঁর কাছে দেবতাদের দুরবস্থার কথা বলেন। বিষ্ণু দেবতাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থনের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থনের ফলে অমৃত উঠে আসবে। সেই অমৃত পান করে দেবতাগণ অসুরদের পরাজিত করার শক্তি ফিরে পাবেন। ভগবান বিষ্ণুর পরামর্শ অনুসারে দেবতাগণ ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন শুরু করলেন। মন্দর পর্বত হলো মন্থন দণ্ড। আর বাসুকি নাগ হলো মন্থনের রজ্জু। মন্দর পর্বত সমুদ্রের তলদেশে বসে যেতে লাগল। বিষ্ণু তখন বিরাট এক কূর্ম বা কচ্ছপরূপে মন্দর পর্বতকে ধারণ করলেন। মন্থন চলতে থাকল। সমুদ্র থেকে অমৃত উঠল। দেবতাগণ সেই অমৃত পান করে অসুরদের পরাজিত করলেন। দেবতারা আবার স্বর্গরাজ্য ফিরে পেলেন। এভাবেই কূর্মরূপী বিষ্ণু অসুরদের অত্যাচার থেকে ত্রিজগৎ রক্ষা করেছিলেন।

কূর্ম অবতার

বরাহ অবতার

বরাহ অবতার

বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার হচ্ছে বরাহ রূপ। একবার মহাপ্রলয়ের সময় পৃথিবী জলে ডুবে যেতে থাকে। তখন বিষ্ণু বরাহরূপে আবির্ভূত হন। তাঁর বিশাল দাঁত দিয়ে তিনি পৃথিবীকে জলের উপর তুলে রাখেন। পৃথিবী রক্ষা পায়। এছাড়া বরাহরূপী বিষ্ণু দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

নৃসিংহ অবতার

নৃসিংহ বা নরসিংহ রূপ হচ্ছে বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার। নৃ বা নর অর্থ মানুষ। নৃসিংহ হচ্ছে মানুষ ও সিংহের মিলিত রূপ। মাথা সিংহের মতো আর শরীর মানুষের মতো। আবার নখগুলো সিংহের মতো। নিজের ভাই হিরণ্যাক্ষকে বরাহরূপী বিষ্ণু হত্যা করেন। এতে হিরণ্যকশিপু প্রচন্ড রেগে বিষ্ণুবিরোধী হয়ে উঠেন। কিন্তু তাঁর পুত্র প্রহ্লাদ ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। হিরণ্যকশিপু নানা কৌশলে প্রহ্লাদকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। প্রতিবারেই বিষ্ণুর কৃপায় প্রহ্লাদ রক্ষা পায়।

একদিন প্রচন্ড রেগে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞেস করলেন– বল্ তোর বিষ্ণু কোথায় থাকে?

প্রহ্লাদ উত্তর দিল– ভগবান বিষ্ণু সব জায়গায়ই থাকেন।

তখন হিরণ্যকশিপু তার প্রাসাদের একটি স্ফটিকস্তম্ভ দেখিয়ে জানতে চাইলেন- এর মধ্যেও কি তোর বিষ্ণু আছে?

প্রহ্লাদ বিনীতভাবে বললেন- হ্যাঁ বাবা, শ্রীবিষ্ণু এখানেও আছেন।

হিরণ্যকশিপু রেগে পায়ের আঘাতে সে স্তম্ভ ভেঙে ফেললেন। তখনই স্তম্ভের ভিতর থেকে ভগবান বিষ্ণু ভয়ঙ্কর নৃসিংহ রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হলেন। তিনি নখ দিয়ে হিরণ্যকশিপুর উদর বিদীর্ণ করলেন। হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার থেকে পৃথিবী রক্ষা পেল।

নৃসিংহ অবতার

- চলো মিলকরণ করি

১। ব্রহ্মার আসন	১। দশভুজা
২। বিষ্ণুর বাহন	২। ভোলানাথ
৩। শিব	৩। গরুড় পাখি
৪। দুর্গা	৪। শক্তিলাভ
৫। লক্ষ্মী দেবী	৫। লালপদ্ম
৬। কালী দেবী	৬। হিরণ্যকশিপু
৭। মৎস্য অবতার	৭। বাসুকিনাগ
৮। কূর্ম অবতার	৮। সাপ
৯। বরাহ অবতার	৯। পেঁচা
১০। মনসা দেবী	১০। তৃতীয়
১১। নৃসিংহ অবতার	১১। রাজা সত্যব্রত

- এসো শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই:

১. স্বয়ম্ভূ	৬. কমণ্ডলু
২. অক্ষমালা	৭. মন্থন
৩. শঙ্খ	৮. রজ্জু
৪. ত্রিশূল	৯. নৃ
৫. বৃষ	১০. উদর

এবার শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তোমার ভালো লাগে এমন একজন দেবতা বা দেবীর ভূমিকা শ্রেণিকক্ষে অভিনয় করে দেখাও।

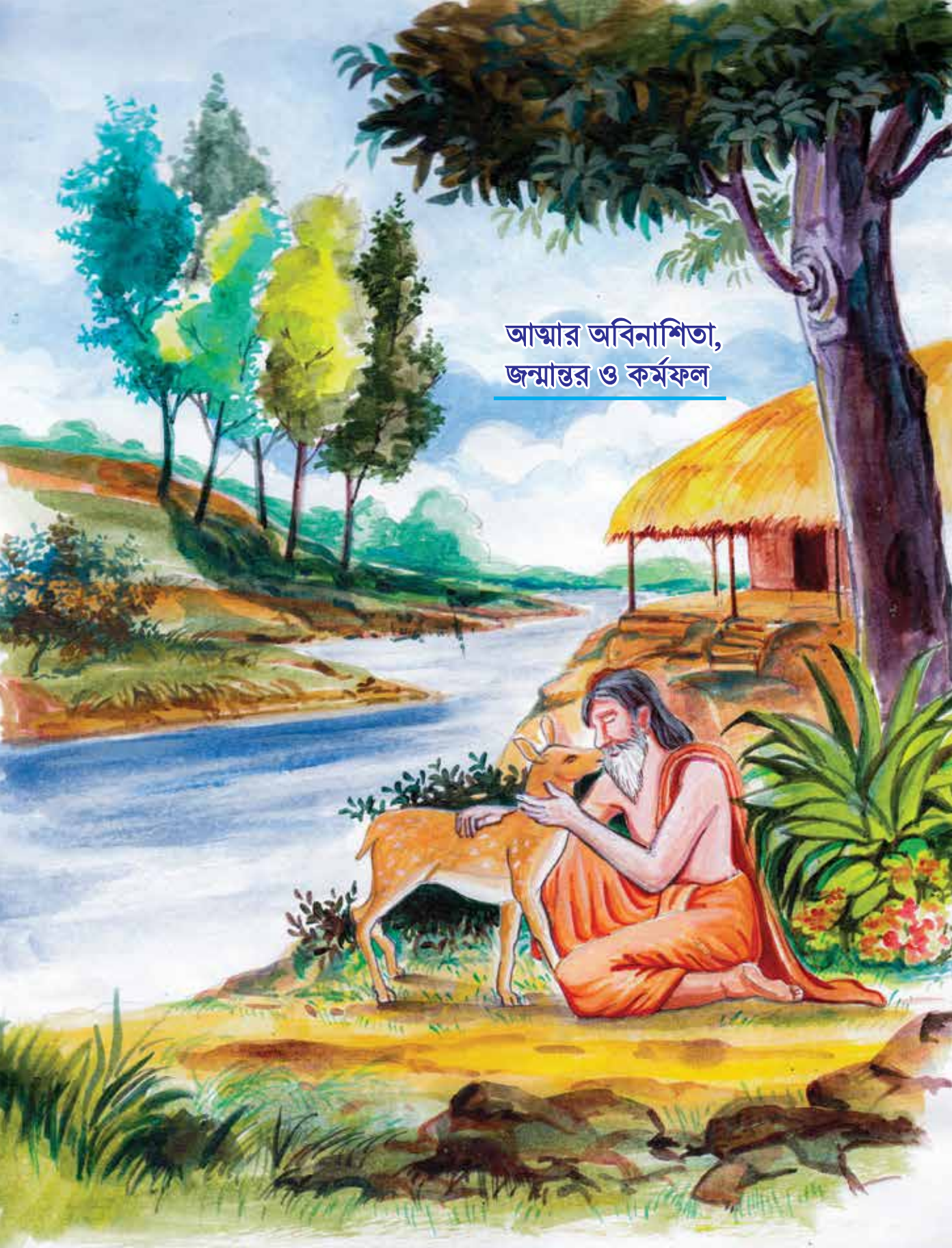

আত্মার অবিনাশিতা, জন্মান্তর ও কর্মফল

পৃথিবীতে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি। আবার এক সময় মৃত্যুকেও বরণ করতে হবে। কিন্তু আমরা কি জানি মৃত্যুর পর কী হয়? জন্মান্তর নিয়ে পুরাণের সুন্দর একটি গল্প পড়ব।

জড়ভরতের কাহিনি: অনেক কাল আগে বিষ্ণুভক্ত এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল ভরত। রাজা ভরত পুত্রদের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দিয়ে তপস্যার জন্য বনে চলে যান। সাধনার ফলে রাজা ভরতকে বলা হয় সাধক ভরত বা মুনিভরত। একদিন তিনি নদীতে স্নান করতে গেলেন। সেখানে সদ্যোজাত মাতৃহারা একটি হরিণশাবক দেখতে পান। তিনি তাকে রক্ষা করার জন্য আশ্রমে নিয়ে আসেন। হরিণশাবকের যত্নে, আদরে তাঁর সময় কাটে। এর ফলে মুনির তপস্যা আর রইল না। এমনকি মৃত্যুর সময়ও এই হরিণ শিশুর কথা চিন্তা করতে করতে তিনি দেহত্যাগ করেন। শাস্ত্রে আছে– মানুষ যেরূপ চিন্তা করতে করতে মৃত্যুবরণ করবে তার সেই রূপেই পুনর্জন্ম হবে। তাই ভরতমুনিকেও হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করতে হলো।

তবে হরিণ হয়ে জন্মলাভ করলেও তিনি ছিলেন জাতিস্মর। অর্থাৎ পূর্বজন্মের কথা তাঁর স্মরণে ছিল। তাই হরিণজীবনেও তপস্বীদের আশ্রমের চারপাশে ঘোরাঘুরি করতেন আর ধর্মকথা শুনতেন। এভাবে তপস্যার কথা শুনতে শুনতে তিনি দেহত্যাগ করে পুনরায় মানবজন্ম লাভ করেন। মানুষ রূপে জন্মলাভ করে তিনি সবসময় ঈশ্বরচিন্তা করতেন। কারও সাথে বেশি কথা বলতেন না। জড়ের মতো থাকতেন। এজন্য তাঁকে জড়ভরত বলা হতো।

যে জন্মান্তর নিয়ে সুন্দর গল্পটি জানলাম এবার এ জন্মান্তর সম্পর্কে আমাদের ধর্মে কী বলা আছে; তা জানব। জন্মান্তরের সাথে কর্মবাদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কর্মফল অবশ্যই মানুষকে ভোগ করতে হয়। যে যেরকম কর্ম করে সে সেই রূপেই পুনর্জন্ম লাভ করে। খারাপ কাজ করলে খারাপ রূপে এবং ভালো কাজ করলে ভালো রূপে পুনর্জন্ম লাভ করবে। সুতরাং আমরা সবাই ভালো কাজ করব।

আত্মার অবিনাশিতা: আমাদের মধ্যে আত্মা আছে। এই আত্মার কোনো বিনাশ নেই। আত্মার কখনও জন্ম হয় না। মৃত্যুও হয় না। পুনঃ পুনঃ তার উৎপত্তি বা বৃদ্ধিও হয় না। তিনি জন্ম রহিত, শাশ্বত, নিত্য এবং পুরাতন। শরীরের বিনাশ হলেও আত্মার কোনো বিনাশ নেই। শুধু এক দেহ থেকে অন্য দেহে গমনাগমন আছে।

জন্মান্তর ও কর্মফল: আমাদের আত্মার কোনো জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। শুধু দেহ থেকে দেহান্তর হয়। এ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২/২২

শব্দার্থ: বাসাংসি– বস্ত্র, কাপড়; জীর্ণানি- জীর্ণ, ছেঁড়া; যথা– যেমন; বিহায়- পরিত্যাগ করে; নবানি– নতুন; গৃহ্লাতি– গ্রহণ করে; নরঃ– মানুষ; অপরাণি– অন্য; তথা- সেরূপ, তেমনি; শরীরাণি– শরীর সমূহ; জীর্ণানি– জীর্ণ বা পুরাতন; অন্যানি– অন্য; সংযাতি– গ্রহণ করে; দেহী- দেহ ধারী, আত্মা।

সরলার্থ: মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও তেমনি জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে।

এই জন্মান্তরের সাথে কর্মফলের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। জীবের কর্ম অনুসারে তার পুনর্জন্ম হয়। এমনকি মৃত্যুকালে যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাবে ভাবিত রূপেই জন্মলাভ করেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের একটি কাহিনি জানব।

- শূন্যস্থান পূরণ করার চেষ্টা করি:

  ১. আত্মা বা পরমাত্মার ---------নেই।

  ২. জীবদেহে অবস্থিত আত্মাকে ------- বলা হয়।

  ৩. যিনি পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করতে পারেন তাঁকে ------- বলা হয়।

  ৪. আমাদের বার বার জন্ম হয় --------ভিত্তিতে।

  ৫. জড়ভরত---------- এর কথা চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেন।

- বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ যোগ করে পূর্ণবাক্য তৈরি করি:

১. আত্মা	একটি হরিণ
২. কর্মানুসারে হয়	জাতিস্মর
৩. রাজা ভরত ছিলেন	জন্মান্তরের
৪. জন্মান্তরে ভরত হয়েছিলেন	অবিনশ্বর
৫. কর্মবাদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক	ভালো-মন্দ

- পাঁচটি ভালো কাজের একটি তালিকা প্রস্তুত করি।

  ক) _____

  খ) _____

  গ) _____

  ঘ) _____

  ঙ) _____

- শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই–

  ১) জন্মান্তর ২) জাতিস্মর

  ৩) অবিনাশিতা ৪) আত্মা

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিত্যকর্ম

আমরা অনেকেই মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নাম শুনেছি। শিশুদের জন্য তিনি অনেক ছড়া ও কবিতা লিখেছেন। এসো, আমরা মদনমোহন তর্কালঙ্কার রচিত **'আমার পণ'** নামক কবিতাটি আবৃত্তি করি।

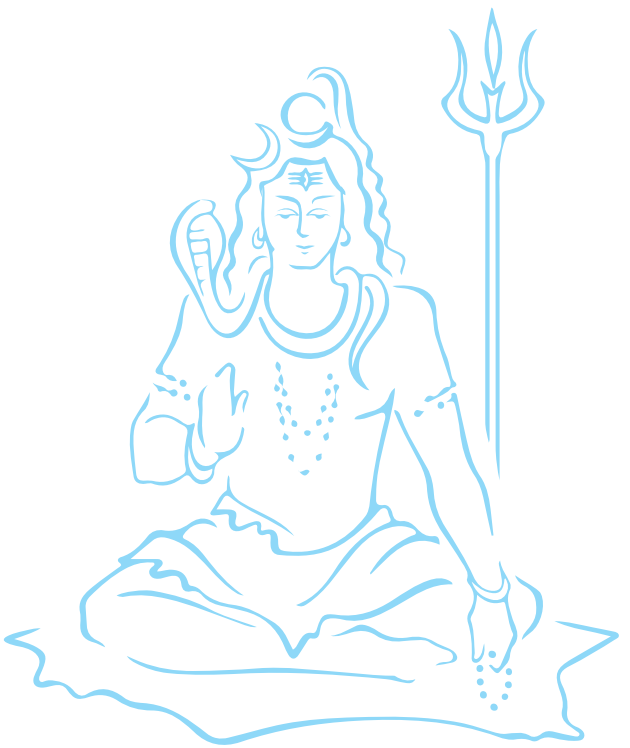

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।
ভাইবোন সকলেরে যেন ভালোবাসি,
এক সাথে থাকি যেন সবে মিলেমিশি।
ভালো ছেলেদের সাথে মিশে করি খেলা,
পাঠের সময় যেন নাহি করি হেলা।
সুখী যেন নাহি হই আর কারো দুখে,
মিছে কথা কভু যেন নাহি আসে মুখে।
সাবধানে যেন লোভ সামলিয়ে থাকি,
কিছুতে কাহারে যেন নাহি দেই ফাঁকি।
ঝগড়া না করি যেন কভু কারো সনে,
সকালে উঠিয়া এই বলি মনে মনে।

■ এই কবিতাটিতে প্রতিদিন কী কী কাজ করতে বলা হয়েছে তার একটি তালিকা করি।

■ এই যে প্রতিদিন যে কাজগুলো আমরা করি সেগুলোকে বলা হয় নিত্যকর্ম। চলো হিন্দুধর্ম মতে নিত্যকর্ম বলতে আমরা কী বুঝি তা আলোচনা করি।

নিত্যকর্ম মানে প্রতিদিনের কর্ম। প্রতিদিন আমরা অনেক কর্ম করি। ঘুম থেকে উঠে রাতে শোয়ার পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে কর্ম। তবে এই কর্মগুলো নিয়ম মেনে করতে হয়। এগুলো নিত্যকর্ম। নিত্যকর্ম চর্চায় নিয়মানুবর্তিতা শেখা যায়। ঈশ্বরের সান্নিধ্যও লাভ করা যায়।

নিত্যকর্ম

'নিত্য' অর্থ প্রত্যহ বা প্রতিদিন । কর্ম মানে কাজ। সুতরাং শাব্দিক অর্থে নিত্যকর্ম বলতে বোঝায় প্রতিদিনের কাজ। ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঈশ্বর ও গুরুর নাম স্মরণ করা। পিতামাতাকে প্রণাম করা। শুচি হয়ে পূজা ও উপাসনা করা। লেখাপড়া, খেলাধুলা, ব্যায়াম করা ইত্যাদি নিত্যকর্মের অংশ।

শাস্ত্রে নিত্যকর্মসমূহকে ছয় ভাগে বর্ণনা করা হয়েছে। যথা: প্রাতঃকৃত্য, পূর্বাহ্নকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য, অপরাহ্নকৃত্য, সায়াহ্নকৃত্য, রাত্রিকৃত্য।

প্রাতঃকৃত্য: সূর্য ওঠার কিছু পূর্বে বা আগে ঘুম থেকে উঠে বিছানার উপরে পূর্ব বা উত্তর দিকে মুখ করে বসতে হয়। এরপর ঈশ্বর বা দেবদেবীদের স্মরণ করে মন্ত্র পাঠ করতে হয়।

সকালের মন্ত্র পাঠরত বালক

এখানে একটি মন্ত্র পাঠ করার জন্য দেওয়া হলো:

ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী
ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতুঃ
কুর্বন্তু সর্বে মম সুপ্রভাতম্ ।।

সরলার্থ: ব্রহ্মা, (মুরারি) বিষ্ণু, (ত্রিপুরবিনাশক) শিব, সূর্য, চন্দ্র, শনি, রাহু এবং কেতু [(ভূমিপুত্র) বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র] সকলে আমার প্রভাতটি সুন্দর করুন– আমার মঙ্গল করুন।

সন্ধ্যা আহ্নিক

পূর্বাহ্নকৃত্য: প্রাতঃকৃত্যের পরে এবং দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত যে সব কাজ করা হয় তাই পূর্বাহ্নকৃত্য। এই সময়ে প্রার্থনা, উপাসনা ও পূজা করতে হয়।

মধ্যাহ্নকৃত্য: পূর্বাহ্নের পরে অর্থাৎ দুপুরে খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রাম করা হলো মধ্যাহ্নকৃত্য।

অপরাহ্নকৃত্য: দুপুরের পর এবং সায়াহ্নের পূর্ব পর্যন্ত যে কাজ করা হয়, তাকেই অপরাহ্নকৃত্য বলা হয়। এ সময় বেড়াতে যাওয়া, খেলাধুলা বা ব্যায়াম অবশ্যই করা উচিত।

সায়াহ্নকৃত্য: সায়াহ্ন মানে সন্ধ্যা। সন্ধ্যাকালে হাত, পা ও মুখ ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হতে হয়। তারপর স্তব-স্তুতি বা ভক্তিমূলক গান গেয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করতে হয়।

রাত্রিকৃত্য: সন্ধ্যার পর থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কাজকে রাত্রিকৃত্য বা নৈশকৃত্য বলা হয়। এ সময় অধ্যয়ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করা হয়। তারপর শ্রীবিষ্ণুর 'পদ্মনাভ' নামটি উচ্চারণ করে ঘুমাতে হয়।

- উপরে উল্লিখিত সময়গুলোতে আমরা কী কী কাজ করি তার একটি তালিকা তৈরি করি।

ছক-১

সময়	সম্পাদিত কাজ

নিত্যকর্মের গুরুত্ব ও প্রভাব

নিত্যকর্ম করলে নিয়মানুবর্তিতা শেখা যায়। সময়ের কাজ সময়ে শেষ হয়। কোনো কাজই একেবারে অসমাপ্ত হয়ে পড়ে থাকে না। কাজে নিষ্ঠাবান হওয়া যায় এবং শৃঙ্খলা বজায় থাকে। নিয়মিত ব্যায়াম, খেলাধুলা এবং আহার গ্রহণে শরীর ভালো থাকে। শরীর সুস্থ থাকলে মন ভালো থাকে। মন ভালো থাকলে সকল কাজে ধৈর্যের সাথে মনোনিবেশ করা যায়। নিয়মিত পিতামাতাকে প্রণাম করলে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সুগভীর হয়। মানুষের প্রতি প্রীতি জন্মে। নিয়মিত অধ্যয়নে ভালো ফলাফল করা যায়। জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয় এবং জীবনে সফলতা আসে। নিয়মিত পূজা ও উপাসনার ফলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সুগভীর হয়। ঈশ্বরকে হৃদয়ে অনুভব করা যায়। আমরা প্রত্যেকে চাই একটি সুন্দর জীবন। সুন্দর জীবনের জন্য প্রয়োজন নিয়মানুবর্তিতা। নিত্যকর্ম আমাদের নিয়ম মেনে চলার অভ্যাস তৈরি করে দেয়। জীবনকে সুন্দর ও সজীব রাখে।

- এসো, এবার নিচের ছক অনুসারে নিজের নিত্যকর্মের একটি রুটিন তৈরি করি এবং এক সপ্তাহের সম্পাদিত কাজের তালিকাটি শিক্ষকের নিকট জমা দিই।

ছক-২

সময়/দিন	রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার	শুক্রবার	শনিবার
প্রাতঃকালে							
পূর্বাহ্নে							
মধ্যাহ্নে							
অপরাহ্নে							
সায়াহ্নে							
রাত্রে							

ওঁ

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শুচিতা, উপাসনা, প্রার্থনা, পূজা, পার্বণ, মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র

- চলো, আজ আমরা একটি মন্দির পরিদর্শনে যাই। মন্দিরে কীভাবে পূজা করা হয়, কীভাবে পূজায় অংশগ্রহণ করতে হয় ইত্যাদি সবকিছু দেখে আসি।

রাজশাহীর পুঠিয়া রাজবাড়ির মন্দির

- আমরা কোনো না কোনো সময়ে মন্দিরে গিয়ে পূজা করতে দেখেছি। কেউ হয়ত পূজা করেছি। একটি পূজা দিতে গিয়ে আমরা যা যা দেখেছি অর্থাৎ যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা নিচের ঘরে লিখি।

- বাড়ি থেকে মন্দিরে যাবার প্রস্তুতি হিসেবে আমরা যেসকল কাজ সাধারণত করে থাকি তার একটি তালিকা তৈরি করি।

- মন্দিরে আমরা কী দেখতে পাই? সেখানে আমরা দেব-দেবী, প্রার্থনা-উপাসনা, পূজা-অর্চনা এগুলো দেখি। মন্দিরের পরিবেশটা একটু অন্যরকম, তাই নয় কি? মন্দিরের পরিবেশ শান্ত ও পরিছন্ন থাকে। সেখানে দেখতে পাই সবাই পরিষ্কার এবং পবিত্র বস্ত্র পরিধান করে উপাসনা করছে। একমনে ঈশ্বরের আরাধনা করছে। আমরা দেখলাম মন্দিরে যেতে হলে পরিষ্কার এবং শুদ্ধভাবে যেতে হয়। মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে আমরা যে অভিজ্ঞতাগুলো লাভ করেছি, এবার সেগুলো সম্বন্ধে আর একটু বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।

- এক্ষেত্রে প্রথমেই আসে শুচিতার কথা। কোনো মন্দিরে যাওয়ার সময় প্রথমেই আমাদের মন এবং শরীরকে পরিষ্কার ও পবিত্র করে যেতে হয় যাকে আমরা শুচিতা বলে থাকি। এবার আমরা ধর্মীয় আলোকে শুচিতা কী, তা জানব।

শুচিতা

শুচিতা মানে নির্মলতা, পবিত্রতা। এটা শারীরিক ও মানসিক দুদিক থেকেই হবে। এই পবিত্রতার শুরু হয় মন থেকে। মনে শুচিতা থাকলে আমরা খারাপ চিন্তা থেকে বিরত থাকি, কারও ক্ষতি করতে চাই না, কারও অশুভও কামনা করি না। মনে শুচিতা থাকলে আমরা আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাকে গুরুত্বপুর্ণ মনে করি।

শুচিতা মানে যেমন মনের পবিত্রতা, তেমন শরীরের পবিত্রতাও। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক, পরিবেশ, প্রকৃতি দেখলে অন্যের মনেও পবিত্রতার অনুভূতি আসে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাটা ঈশ্বর পছন্দ করেন। শুচিতা ধর্মের অঙ্গ। শুচিতার মাধ্যমে শরীর ও মনের পবিত্রতা আনা যায়। শরীর ও মনকে সাধনার উপযোগী করার জন্য শুচিতা প্রয়োজন। শুচিতা প্রধানত দুই প্রকার, যথা: অভ্যন্তরীণ শুচিতা ও বাহ্যিক শুচিতা।

মন্দিরে প্রার্থনার ছবি

অভ্যন্তরীণ শুচিতা: অভ্যন্তরীণ শুচিতা বলতে মনের বা অন্তরের শুচিতাকে বোঝায়। বিদ্যার্জন, সদাচরণ প্রভৃতির মাধ্যমে মনের বা অন্তরের শুচিতা অর্জন করা যায়। পৃথিবীর সকল প্রাণীর মঙ্গল কামনা করা, সবার জন্য সুচিন্তা করা, মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে কথা না বলা– এগুলো সবই ভালো মনের পরিচয় বা অভ্যন্তরীণ শুচিতার প্রতিফলন।

বাহ্যিক শুচিতা: বাহ্যিক শুচিতা বলতে শারীরিক শুচিতা বোঝায়। জল দিয়ে বাহ্যিকভাবে শুচি হওয়া যায়। আমরা প্রতিদিন হাত-মুখ ধুই, স্নান করি। এভাবে বাহ্যিক শুচিতা অর্জন করি। এছাড়া পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিষ্কার করার মাধ্যমেও বাহ্যিক শুচিতা অর্জন করা যায়।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা: শুচিতার ন্যায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও ধর্মের অঙ্গ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বলতে সুন্দর ও পরিপাটি অবস্থাকে বোঝায়। উপাসনা, প্রার্থনা, পূজা-পার্বণের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হয়। কারণ ধর্মীয় কাজের ক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন সবার আগে। অপরিষ্কার অবস্থায় ধর্মীয় কাজে মন বসে না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মধ্যে পড়ে এমন আরও অনেক কিছু আছে। যেমন, নিজের কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখা, বাড়ির বিভিন্ন জিনিসপত্র পরিপাটি করে রাখা, আশপাশের পরিবেশ সুন্দর রাখা। বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর রাখা ইত্যাদি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ব্যক্তিগত হতে পারে আবার সর্বজনীনও হতে পারে।

নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে হয়। নিজের শরীরের যত্ন নিতে হয়। এগুলো ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। বিদ্যালয়, মন্দির, ধর্মক্ষেত্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। বাড়ির আঙিনা, রাস্তাঘাট, খেলার মাঠ, আশপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। সবার অংশগ্রহণে এই পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। এটাই সর্বজনীন পরিচ্ছন্নতা।

শুচিতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

শুচিতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ধর্মচর্চার পূর্বশর্ত। শুচিতা প্রার্থনার অপরিহার্য অংশ। শুচিতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় শরীর ও মন সুস্থ থাকে। আর শরীর ও মন সুস্থ থাকলে ধর্ম-কর্ম ভালো হয়। পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়া যায়। সর্বজনীন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় সর্বক্ষেত্রে সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়। মূলত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় সবার মঙ্গল হয়।

■ চলো, নিচের মিলকরণটি করি। বামদিকের কলামের তথ্যের সাথে ডানদিকের তথ্য মিল করতে হবে। দেখো, একটি মিল করে দেওয়া আছে।

অভ্যন্তরীণ শুচিতা	মানুষের মঙ্গল কামনা করা
	ঘর মোছা
	স্নান করা
বাহ্যিক শুচিতা	হাত-মুখ ধোয়া
	সদাচরণ
	ভক্তিমূলক গান গাওয়া
	খেলার মাঠ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা

উপাসনা ও প্রার্থনা

উপাসনা

ঈশ্বরকে আমরা কাছে পেতে চাই। ঈশ্বরকে ভালোবেসে তাঁর কাছে আমরা বসতে চাই। ঈশ্বরের কাছে বসাই উপাসনা। ধর্মগ্রন্থে উপাসনা নিয়ে অনেক কথা আছে। সে কথাই এখন আমরা জানব।

'উপ' অর্থ নিকটে এবং 'আসন' অর্থ বসা। ঈশ্বরের উপাসনা অর্থ ঈশ্বরের নিকটে বসা। অর্থাৎ, যে কর্মের মধ্যদিয়ে আমরা ঈশ্বরকে কাছে পেতে পারি, তার নাম উপাসনা। একাগ্রচিত্তে ভক্তিভরে ঈশ্বরের আরাধনা করাই উপাসনা। উপাসনা ধর্মপালনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ বা পদ্ধতি। পূজা-অর্চনা, স্তব-স্তুতি, ধ্যান, জপ, কীর্তন, প্রার্থনা প্রভৃতি পদ্ধতিতে উপাসনা করা হয়। উপাসনার ফলে আমাদের দেহ-মন পবিত্র হয়। উপাসনার মাধ্যমে আমরা সকলের কল্যাণ কামনা করি। ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

সাকার ও নিরাকার দুভাবেই ঈশ্বরের উপাসনা করা যায়।

সাকার উপাসনা হলো নিরাকার ঈশ্বরের আকার বা মূর্ত রূপের মাধ্যমে আরাধনা করা। 'সাকার' অর্থ যার আকার বা মূর্তরূপ আছে। আমরা ঈশ্বরকে দেবদেবীর প্রতিমারূপে উপাসনা করি। বিভিন্ন দেবদেবী, যেমন— কার্তিক, গণেশ, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি ঈশ্বরের সাকার রূপ। পূজারী ও ভক্ত ঈশ্বরকে সাকাররূপে পূজা করে। তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে।

নিরাকার মানে যার কোনো আকার বা রূপ নেই। ব্রহ্মের কোনো রূপ নেই। ব্রহ্মই ঈশ্বর। ঈশ্বরের কোনো প্রকার প্রতীক বা মূর্তরূপ ছাড়া ধ্যানস্থ হয়ে উপাসনা করাই নিরাকার উপাসনা। ঈশ্বর নিরাকার। জগতের কল্যাণে নিরাকার ঈশ্বর সাকার রূপ ধারণ করেন। যিনি নিরাকার, তিনিই আবার সাকার। নিরাকাররূপে ঈশ্বরের উপাসনা হচ্ছে ধ্যান। সাকাররূপে ঈশ্বরের উপাসনা হচ্ছে পূজা। উপাসনা প্রতিদিন করতে হয়। তাই এটি একটি নিত্যকর্ম। উপাসনার আগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। একা বসে উপাসনা করা যায় আবার কয়েকজন মিলে একসাথে বসেও উপাসনা করা যায়। কয়েকজন একত্র হয়ে উপাসনা করাকে সমবেত উপাসনা বলা হয়।

পারিবারিক পূজা

ঈশ্বরের উপাসনায় দেহমন পবিত্র হয়। উপাসনা আমাদেরকে সৎপথে বা ধর্মপথে পরিচালিত করে। সকলের কল্যাণ কামনায় আমরা নিয়মিত উপাসনা করব।

প্রার্থনা

আমরা কেউ পরিপূর্ণ নই। প্রত্যেকেরই কিছু চাওয়া পাওয়া আছে। বড়দের কাছেও চাই আবার ছোটদের কাছেও চাই। তবে কেবল অভাবের জন্যই আমরা চাই না। ভালো থাকার জন্যও চাই। নিজের এবং সকলের মঙ্গলের জন্যও চাই। এই চাওয়াই হচ্ছে প্রার্থনা। এখন আমরা প্রার্থনা সম্পর্কে জানব।

ঈশ্বর সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি দয়াময়। করুণাময়। তাঁর ইচ্ছার উপরেই আমাদের সবকিছু নির্ভর করে। আমরা তাঁর কাছেই সবকিছু চাই। ঈশ্বরের কাছে ভক্তিমনে কিছু চাওয়াই হচ্ছে প্রার্থনা। উপাসনার একটি অঙ্গ হলো প্রার্থনা। প্রার্থনা করার আগে নিজেকে শুচি করতে হয়। পবিত্র হতে হয়। মনে বিনয়ীভাব থাকতে হয়। একা বা সমবেতভাবেও প্রার্থনা করা যায়। আমরা নিজের ও সকলের কল্যাণ কামনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে থাকি।

নমস্কাররত দুইজন শিক্ষার্থী

■ এবার বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশ যোগ করে পূর্ণবাক্য তৈরি করো।

উপাসনার মাধ্যমে	বিনয়ীভাব রাখতে হয়
প্রার্থনার সময় মনে	অঙ্গ হলো প্রার্থনা
উপাসনার একটি	মনে অন্যদের অমঙ্গল কামনা করি
আমরা অন্ধকার হতে	আলোর দিকে যেতে চাই
উপাসনা আমাদেরকে	সৎপথে ও ধর্মপথে পরিচালিত করে
	সকলের মঙ্গল কামনা করা যায়
	সহপাঠীদের অসহযোগিতা করা যায়

স্তব-স্তুতি ও প্রার্থনামূলক কবিতা

হিন্দুধর্মের অনেক ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। এর মধ্যে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব ধর্মগ্রন্থে ঈশ্বরের স্তব ও প্রার্থনামূলক অনেক মন্ত্র ও শ্লোক রয়েছে। সেখানে ঈশ্বর ও দেবদেবীর রূপ, গুণ, মাহাত্ম্য প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদসহ অনেক কবি সাহিত্যিকের রচিত বাংলা ভাষায় প্রার্থনামূলক গান ও কবিতা রয়েছে। এসব মন্ত্র, শ্লোক, প্রার্থনামূলক কবিতা, গান চর্চা করলে মন পবিত্র হয়। মনে ঈশ্বরের উপলব্ধি অনুভূত হয়।

আমরা এখন ধর্মগ্রন্থাবলি থেকে সরলার্থসহ কিছু মন্ত্র ও শ্লোক এবং প্রার্থনামূলক বাংলা কবিতা শিখব।

■ বেদ

গায়ত্রী মন্ত্র:

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ
তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।।

সরলার্থ: সবিতা দেবের বরণীয় তেজকে (জ্যোতিকে) আমরা ধ্যান করি। যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রণোদিত করেন।

■ উপনিষদ

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।

(১/২/২৮)
(বৃহদারণ্যক উপনিষদ)

শব্দার্থ: অসতো (অসতঃ) – অসৎ থেকে; সদ্গময় (সৎগময়)– সত্যে নিয়ে যাও; তমসো (তমসঃ)– অন্ধকার থেকে; জ্যোতির্গময়– (জ্যোতিঃ+গময়)– জ্যোতিতে অর্থাৎ আলোতে নিয়ে যাও; মৃত্যোর্মা– (মৃত্যোঃ+মা); মৃত্যোঃ– মৃত্যু থেকে; মা– আমাকে; অমৃতং–অমৃতে, গময়–নিয়ে যাও।

সরলার্থ: আমাকে অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও।

- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ।।

(৪/৩৮)

শব্দার্থ: ন– নাই; হি– অবশ্যই; জ্ঞানেন– জ্ঞানের; সদৃশম্স– মান/তুল্য; পবিত্রম্প– বিত্র; ইহ - এই জগতে; বিদ্যতে– বিদ্যমান; তৎ– তা; স্বয়ম্– নিজে; যোগসংসিদ্ধ– যোগ সিদ্ধগণ; কালেন– কালক্রমে/যথাসময়ে; আত্মনি– আত্মাতে; বিন্দতি– অনুভব করেন।

সরলার্থ: এই জগতে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নেই। যোগসিদ্ধগণ যথাসময়ে সে জ্ঞানকে নিজ আত্মাতে অনুভব করেন।

- শ্রীশ্রীচণ্ডী

সর্বমঙ্গলমঙ্গাল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে। (১১/১০)

শব্দার্থ: সর্বমঙ্গলমঙ্গাল্যে– সকল মঙ্গালের মঙ্গাল স্বরূপা; শিবে– কল্যাণদায়িনী; সর্বার্থসাধিকে(সর্ব+অর্থসাধিকে)– সকল প্রকার সিদ্ধি(সুফল) প্রদায়িনী; শরণ্যে– আশ্রয়স্বরূপা; ত্র্যম্বকে– ত্রিনয়না; গৌরি– গৌরবর্ণা; নমোঽস্তু তে(নমোঃ+অস্তু তে)– তোমাকে নমস্কার।

দ্রষ্টব্য: স্ত্রীলিঙ্গো আ(া)-কারান্ত শব্দের সম্বোধনের একবচনে এ(ে)-কার এবং ঈ(ী)-কারান্ত শব্দের সম্বোধনের একবচনে ই(ি)-কার হয়।

সরলার্থ: হে নারায়ণী, গৌরী, তুমি সকল মঙ্গালের মঙ্গালস্বরূপা, কল্যাণদায়িনী, সকল প্রকার সুফল প্রদায়িনী, আশ্রয়স্বরূপা, ত্রিনয়না তোমাকে নমস্কার।

- প্রার্থনামূলক বাংলা কবিতা

অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে–
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে॥
জাগ্রত করো, উদ্যত করো, নির্ভয় করো হে।
মঙ্গাল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে॥
যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ।
সঞ্চার করো সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ।
চরণপদ্মে মম চিত নিস্পন্দিত করো হে।
নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে॥

(গীতাঞ্জলি)

- এবার ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার অথবা বাবা-মা/অভিভাবকের সাথে আলোচনার মধ্যদিয়ে একটি প্রার্থনামূলক গান/স্তব-স্তুতি/শ্লোক নির্বাচন করে নিচে লেখি। অনুশীলন করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করি।

দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ

■ দেবদেবী

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি, নিরাকার ঈশ্বরের সাকার রূপ হলো দেবদেবী। ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা শক্তি যখনই আকার পায়, তখন তাঁদের দেবদেবী বলে। এসব দেবদেবী ঈশ্বরের বিশেষ গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। তাই আমরা এই শক্তি বা গুণ লাভ করার জন্য দেবদেবীর পূজা করে থাকি। পূজার মধ্যদিয়ে আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই। প্রার্থনা করি তাঁরা যেন আমাদের মঙ্গল করেন।

■ পূজা

হিন্দুধর্মে ঈশ্বরকে নানাভাবে চিন্তা করা হয়। নানাভাবে দেখা হয়। ঈশ্বর নিরাকার আবার তিনি সাকারও। ঈশ্বরকে নিরাকার ও সাকার দুভাবেই উপাসনা করা হয়। পূজা ঈশ্বরের সাকার উপাসনার একটি পদ্ধতি। পূজা শব্দের অর্থ প্রশংসা করা বা শ্রদ্ধা করা। ঈশ্বরের প্রতীকরূপে আছেন বিভিন্ন দেবদেবী। বিভিন্ন দেবদেবীকে আমরা স্তব-স্তুতি করি। ফুল-ফল ও নানা উপকরণ দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এই স্তব-স্তুতি, শ্রদ্ধা নিবেদন করার প্রক্রিয়া হলো পূজা। পূজার সময়ে মন্ত্র পাঠ করে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়। দেবতার আরতি এবং ধ্যান করা হয়। সকল জীবের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হয়।

পূজার প্রক্রিয়াগত দিক হলো পূজাবিধি বা পূজা পদ্ধতি। পূজার আয়োজনের বিভিন্ন দিক আছে। দেবতার প্রতিমা তৈরি, পূজার উপচার, তাঁর কাছে প্রার্থনা ইত্যাদি। এ সকল পূজার প্রক্রিয়াগত দিকের সঙ্গে যুক্ত দেশ ও অঞ্চলভেদে পূজাপদ্ধতির বিভিন্নতা আছে। তবে পূজা করার মৌলিক দিকগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আবাহন, অর্ঘ্য প্রদান, ধ্যান, পূজামন্ত্র, পুষ্পাঞ্জলি, প্রার্থনামন্ত্র, প্রণামমন্ত্র ইত্যাদি পূজার বিভিন্ন অঙ্গ। আমরা প্রতিদিন পূজা করি। আবার তিথি ভেদে, মাস ও বছরের বিশেষ সময় অনুসারে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার আয়োজন করা হয়। দেবদেবী অনুসারে পূজা পদ্ধতি ও মন্ত্র পৃথক হয়ে থাকে। তবে যেকোনো দেবদেবীর পূজা করার ক্ষেত্রে কতগুলো সাধারণ নিয়ম থাকে। তা অবশ্যই অনুসরণ করতে হয়। সাধারণভাবে এই নিয়ম-নীতিগুলোকে পূজাবিধি বলে।

■ পূজার গুরুত্ব

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে বাস করাই মানুষের প্রকৃতি। ধর্ম সমাজকে সুগঠিত করে গড়ে তোলে। আধ্যাত্মিক ও আর্থসামাজিক দিক থেকে পূজা-পার্বণ যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। পূজা-পার্বণের মাধ্যমে সামাজিক মিলনের সৃষ্টি হয়। সকলে মিলে যখন পূজা করা হয় তখন পূজা হয়ে ওঠে পার্বণ বা উৎসবমুখর।

প্রতিমা আনয়ন, পূজার উপকরণ সংগ্রহ, মন্দিরে পূজার সাজসজ্জা, ধূপের গন্ধ, আরতি, প্রসাদ বিতরণ, নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান প্রভৃতি আমাদের মনে সুন্দর ও পবিত্র ভাবের সৃষ্টি করে। এর ফলে আমাদের ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের ভাব জাগ্রত হয়। পূজার মাধ্যমে মনের সৌন্দর্যের সঙ্গে একাগ্রতাও সৃষ্টি হয়। পূজায় অভীষ্ট দেবতার প্রতি একাগ্রতা ও ভক্তি জাগ্রত করে। পূজা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

যেমন: ধর্মীয় আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলা ইত্যাদি। অনেকে স্মরণিকাও প্রকাশ করে থাকেন। পূজা-পার্বণ উপলক্ষ্যে এসব আয়োজন আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়।

পূজা-পার্বণে পারিবারিক, সামাজিক পর্যায়েও উন্নত খাবার-দাবারের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন পূজায় ঋতুভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ফল খাওয়া হয়। কারণ প্রত্যেক পূজায় কিছু সুনির্দিষ্ট ফলের প্রয়োজন হয়। পূজায় বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদেরও প্রয়োজন হয়, যা পূজার উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। এখানে পূজার কিছু উপকরণ বা দ্রব্যের কথা উল্লেখ করা হলো: বেলপাতা, তুলসী, ফুল-ফল, ধূপ, দীপ, ডাব-নারিকেল, জলঘট, কোশা-কুশি, শঙ্খ, কাঁসর-ঘণ্টা, চন্দন, আতপ চাল, ধান-দূর্বা, তিল, হরীতকী, ঘি-মধু প্রভৃতি

- এখানে গণেশ দেবতা ও সরস্বতী দেবীর পূজা পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো।

গণেশ দেবতার পূজা

■ গণেশ দেবতা

গণেশ আমাদের একজন অতি পরিচিত দেবতা। গণেশকে বিঘ্ননাশকারী, সিদ্ধিদাতা বা সফলতার দেবতারূপে পূজা করা হয়। বিভিন্ন শুভকার্য, উৎসব ও অনুষ্ঠানের শুরুতে গণেশ পূজা করতে হয়। গণেশদেব– গণপতি, বিনায়ক, গজানন, একদন্ত, হেরম্ব প্রভৃতি নামেও পরিচিত। গণেশদেবের শরীর মানুষের মতো। কিন্তু উপরের অংশে আছে গজ বা হাতির মাথা। এজন্য গণেশকে গজানন বলা হয়। তাঁর চার হাত এবং তিনটি চোখ। তাঁর শরীর মোটা ও উদর লম্বা। মানবকল্যাণের জন্য এক হাতে তিনি ধারণ করেছেন বরদমুদ্রা। তাঁর বাহন হলো মূষিক বা ইঁদুর। গণেশ দেবতা মানুষের সকল বাধাবিপত্তি দূর করেন। সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য দান করেন। এ কারণে যেকোনো কাজ আরম্ভ করার পূর্বে গণেশ দেবতার পূজা করা হয়। হিন্দুধর্মাবলম্বী ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে গণেশ দেবতার ছবি বা প্রতিমা সংরক্ষণ ও পূজা করেন। তাঁরা বাংলা নববর্ষে হালখাতার উদ্বোধন করেন সিদ্ধিদাতা গণেশ দেবতার পূজার মাধ্যমে। ধর্মগ্রন্থে গণেশ দেবতার জ্ঞান ও বীরত্বের অনেক কাহিনি বর্ণিত আছে।

■ পূজা পদ্ধতি

ভাদ্র ও মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে গণেশদেবের পূজা করা হয়। এছাড়া যে-কোনো পূজা করার আগে গণেশদেবের পূজা করার রীতি রয়েছে। পূজা যথাযথভাবে সমাপ্ত করার জন্য পূজার উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। যেমন: দূর্বা, লাল ফুল, পান পাতা, সুপারি, ধূপ, নারকেল, লাল চন্দন, মোদক (মিষ্টি), আরতির থালা, ফলমূল ইত্যাদি। এরপর শুদ্ধ আসনে বসে গণেশের বন্দনা করতে হয়। "ওম্ গণপতয়ে নমঃ" উচ্চারণের মাধ্যমে গণেশ বন্দনা করতে হয়। ধূপ, দীপ জ্বালিয়ে নানা উপচার দিয়ে পূজা আরম্ভ করতে হয়। এরপর গণেশদেবের ধ্যান, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রণাম মন্ত্র পাঠ করতে হয়।

■ প্রণাম মন্ত্র

একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননম্।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণামাম্যহম্ ।।

শব্দার্থ: একদন্তং– এক দাঁত; মহাকায়ং– বিশাল শরীর; লম্বোদরং (লম্ব+উদরং)– বড় পেট; গজাননম্ (গজ+আননম্)– গজ- হাতি; আনন– মুখ; বিঘ্ননাশকরং– বিঘ্ন নাশকারী; দেবং– দেবতা; হেরম্বং– হেরম্ব; প্রণামাম্যহম্– (প্রণমামি+অহম্)– প্রণমামি- প্রণাম করি; অহম্– আমি।

** সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে এখানে অনুস্বারযুক্ত সব শব্দ একবচনে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়েছে।

সরলার্থ: যিনি এক দাঁত বিশিষ্ট, যাঁর শরীর বিশাল, লম্বা উদর, যিনি গজানন এবং বিঘ্ননাশকারী, সেই হেরম্বদেব গণেশকে প্রণাম জানাই।

■ গণেশদেবের পূজার শিক্ষা

গণেশ মূলত বিঘ্ননাশকারী দেবতা। তাই গণেশদেবের পূজা করলে সকল প্রকার বাধা দূর হয় এবং যেকোনো কাজে সফলতা আসে। গনেশ দেবতা আমাদের কাজের সিদ্ধি প্রদান করেন। এজন্য তাঁকে সিদ্ধিদাতা বলা হয়। গণেশ পূজা করলে সংসারে সুখ-সমৃদ্ধি আসে। তাই হিন্দুধর্মে যে কোনো পূজার আগে গণেশ পূজা করতে হয়। সকল কাজের আগে গণেশ দেবতাকে স্মরণ বা পূজা শুভকর ও মঙ্গলজনক। তাই যেকোনো কাজ আরম্ভ করার সময় আমরা গণেশদেবকে স্মরণ করব। পূজার বিধান অনুসারে ভক্তি সহকারে তাঁর পূজা করব।

■ সরস্বতী দেবী

জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও সুরের দেবী হলেন সরস্বতী। তিনি বিদ্যাদাত্রী ও জ্ঞানদাত্রী। জ্ঞান হচ্ছে আলো যা অন্ধকার দূর করে। জ্ঞানের আলোয় অজ্ঞানতার অন্ধকার, বিদ্যার আলোয় অবিদ্যার অন্ধকার যিনি দূর করে দেন, তিনিই হলেন দেবী সরস্বতী। সরস্বতী দেবী বাগ্দেবী, বীণাপাণি, সারদা, শতরূপা, বিরজা, মহাশ্বেতা, ব্রাহ্মী প্রভৃতি নামে পরিচিত।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীদের সরস্বতী পূজা

সরস্বতী দেবীর বসন শুভ্র বা সাদা। তাঁর গায়ের রং চন্দ্রের কিরণের মতো শুভ্র। তাঁর হাতে থাকে বীণা ও পুস্তক। রাজহংস তাঁর বাহন। তাঁর গলায় থাকে অক্ষমালা বা মুক্তার মালা। সাদা পদ্মফুল বেষ্টিত তাঁর আসন। শুভ্রবর্ণ হচ্ছে সত্ত্বগুণের প্রতীক। সত্ত্বগুণ পবিত্রতা, স্বচ্ছতা ও নির্মলতার প্রতীক। তাই সরস্বতী দেবীর শুভ্রবর্ণ প্রকৃত জ্ঞানের ও বিশুদ্ধতা নির্দেশ করে।

■ পূজা পদ্ধতি

মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী দেবীর পূজা করা হয়। পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে সরস্বতী পূজা করা যায়। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাড়ম্বরে সরস্বতী দেবীর পূজা হয়। প্রতিমার মাধ্যমে দেবীর সাকার রূপ গড়ে নিয়ে সাধারণত পূজা করা হয়। অনেকে প্রতিমার পরিবর্তে কেবল পুস্তক ও দোয়াত-কলমের পূজা করেন। পূজার পদ্ধতি হিসেবে মন্ডপ সাজানো, পূজার উপকরণ (পলাশ ফুল, গাদা ফুল, বেলপাতা, ধান, যব, দূর্বা, আম্রপল্লব, কুলসহ নানা প্রকার ফল, দোয়াত-কলম প্রভৃতি) সংগ্রহ করতে হয়। এরপর শুদ্ধ আসনে পূর্ব বা উত্তর মুখে বসে আচমন করে সংকল্প করতে হয়। এরপর দেবীর ঘট স্থাপন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয় অর্থাৎ দেবীকে আমন্ত্রণ জানাতে হয়। মন্ত্র পাঠ করে দেবীর পূজা করতে হয়। এ সময় শঙ্খ, ঘণ্টা ও উলুধ্বনি দিতে হয়। পূজার রীতি হিসেবে সরস্বতী দেবীর ধ্যান, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রণাম মন্ত্র পাঠ করতে হয়।

■ পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ-বিদ্যাস্থানেভ্যঃ এব চ।।
এষ সচন্দন-বিল্বপত্র-পুষ্পাঞ্জলিঃ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ ।।

শব্দার্থ: সরস্বত্যৈ- সরস্বতীকে; নমো (নমঃ) নমস্কার; নিত্যং– সর্বদা; ভদ্রকাল্যৈ– ভদ্রকালীকে; বিদ্যাস্থানেভ্যঃ– বিদ্যাস্থানীয় বিদ্যাসমূহকে; সচন্দন– চন্দনযুক্ত; বিল্বপত্র–বেলপাতা।

সরলার্থ: দেবী সরস্বতী, ভদ্রকালীকে সর্বদা প্রণাম করি। বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ ইত্যাদি বিদ্যাস্থানকেও প্রণাম করি। চন্দনযুক্ত বিল্বপত্র ও পুষ্পের অঞ্জলি দিয়ে সরস্বতী দেবীকে প্রণাম জানাই।

■ প্রণাম মন্ত্র

ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে ।।

শব্দার্থ: সরস্বতি– হে সরস্বতী; মহাভাগে– মহাভাগ; বিদ্যে– বিদ্যা; কমললোচনে– পদ্মের মতো চোখ; বিশ্বরূপে– বিশ্বরূপ; বিশালাক্ষি– বিশালাক্ষী(বড়ো চোখ যার); বিদ্যাং– বিদ্যা; দেহি– দাও; নমোঽস্তু (নমঃ+অস্তু)– নমস্কার; তে– তোমাকে।

** এখানে সবগুলি শব্দ সম্বোধনে আছে। স্ত্রীলিঙ্গ আ(া)কারন্ত শব্দের সম্বোধনের একবচনে এ(ে) কার এবং ঈ(ী)-কারন্ত শব্দের সম্বোধনের ই(ি)-কার হয়।

সরলার্থ: হে মহাভাগ বিদ্যাদেবী সরস্বতী, কমলনয়না, তুমি বিশ্বরূপা। বিশাল তোমার চোখ। তুমি বিদ্যাদান করো। তোমাকে প্রণাম করি।

■ সরস্বতী দেবীর পূজার শিক্ষা

সরস্বতী বিদ্যার দেবী। সরস্বতী পূজার মাধ্যমে মনের অন্ধকার বা অজ্ঞতা দূর হয়। জ্ঞান বিকাশের জন্য বিদ্যাদেবীর কাছে প্রার্থনা করা হয়। বিদ্যাদেবীর পূজা করে বিদ্যার্থীদের জ্ঞান আহরণের অনুরাগ বেড়ে যায়। সামাজিক দিক থেকে সরস্বতী পূজার গুরুত্ব অনেক বেশি। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুধর্মাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীরা এ দিনটি অত্যন্ত ভক্তি ভরে উদযাপন করে থাকে। সরস্বতী পূজার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিদ্যা অর্জনের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। তাদের মধ্যে এমন দৃঢ় মনোবল তৈরি হয় যে, তারা ভবিষ্যৎ স্বপ্ন পূরণের জন্যও আশান্বিত হয়ে ওঠে। তাই তারা বিদ্যাদেবী সরস্বতীর কাছে বিনীতভাবে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে।

সরস্বতী পূজার দিনে সমাজের সকল শ্রেণির পূজারী বিভিন্ন পূজামণ্ডপে দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার জন্য মিলিত হয়। মিলিত হয়ে তারা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে এসব জ্ঞান বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে পারস্পরিক কুশল বিনিময়ে সকলের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। সম্পর্কের গভীরতা বৃদ্ধি পায়। পূজারী ছাড়াও অনেকে পূজার স্থানে আসে। এতে সবার সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়। এই সুসম্পর্ক সমাজকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে।

পার্বণ

পার্বণ হলো কোনো পর্বকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান বা উৎসবের আয়োজন। উৎসব মানে আনন্দময় অনুষ্ঠান। আমরা পার্বণ বলতে বুঝি, যে পর্বগুলো পূজা অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে। দেবদেবীর প্রতি গভীর ভক্তির সৃষ্টি করে। পার্বণের মধ্যে রয়েছে প্রতিমা নির্মাণ। মন্দির বা ঘর সাজানো। বিভিন্ন ধরনের বাদ্যের আয়োজন করা। বিশেষ করে ঢাক, ঢোল, ঘণ্টা, করতাল, কাঁসি, শঙ্খ ইত্যাদি বাদ্য বাজানো। সকলের সাথে ভাববিনিময়, নানা ধরনের খাওয়া-দাওয়া, বিভিন্ন ধরনের আনন্দমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন, নূতন ও পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা ইত্যাদিও পার্বণের অঙ্গ। এখানে কয়েকটি পার্বণ সম্পর্কে জানব।

■ নবান্ন

বাড়িতে নবান্নের উৎসব

আবহমান বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী সর্বজনীন উৎসব হলো নবান্ন। এটি আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। নবান্ন শব্দের অর্থ নতুন অন্ন। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনটি নবান্ন উদযাপন দিন হিসেবে পরিচিত। অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান কাটার পর এই পার্বণ পালন করা হয়। আমন ধান কাটার পর নতুন ধানের চাল দিয়ে তৈরি অন্ন, নানা রকম পিঠা-পায়েস প্রভৃতি দিয়ে যে মাঙ্গলিক উৎসব করা হয় তারই নাম নবান্ন। তখন চারদিকে বাতাসে উড়ে বেড়ায় নতুন ধানের গন্ধ। এটি ঋতুভিত্তিক অনুষ্ঠান। এদিন শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীলক্ষ্মীর পূজা করা হয়।

■ পৌষসংক্রান্তি

বাংলা মাসের শেষ দিনটিকে বলা হয় সংক্রান্তি। তাই পৌষ মাসের শেষ দিন পৌষসংক্রান্তি নামে পরিচিত। এটি একদিকে ধর্মীয় অন্যদিকে সামাজিক উৎসব। বাঙালি সংস্কৃতিতে পৌষসংক্রান্তি একটি বিশেষ পার্বণের দিন। সংক্রান্তি শব্দটি কোথাও কোথাও 'সাকরাইন' নামে পরিচিত। তবে বাঙালি সমাজে পৌষসংক্রান্তি ও চৈত্রসংক্রান্তি এ দুটি উৎসবই উল্লেখযোগ্য। পৌষ পার্বণ বা পৌষসংক্রান্তিকে মকরসংক্রান্তিও বলা হয়। পৌষসংক্রান্তির দিন বাঙালিরা পিঠা উৎসব, ঘুড়ি ওড়ানোসহ নানারকম উৎসবের আয়োজন করে। আনন্দে মেতে ওঠে।

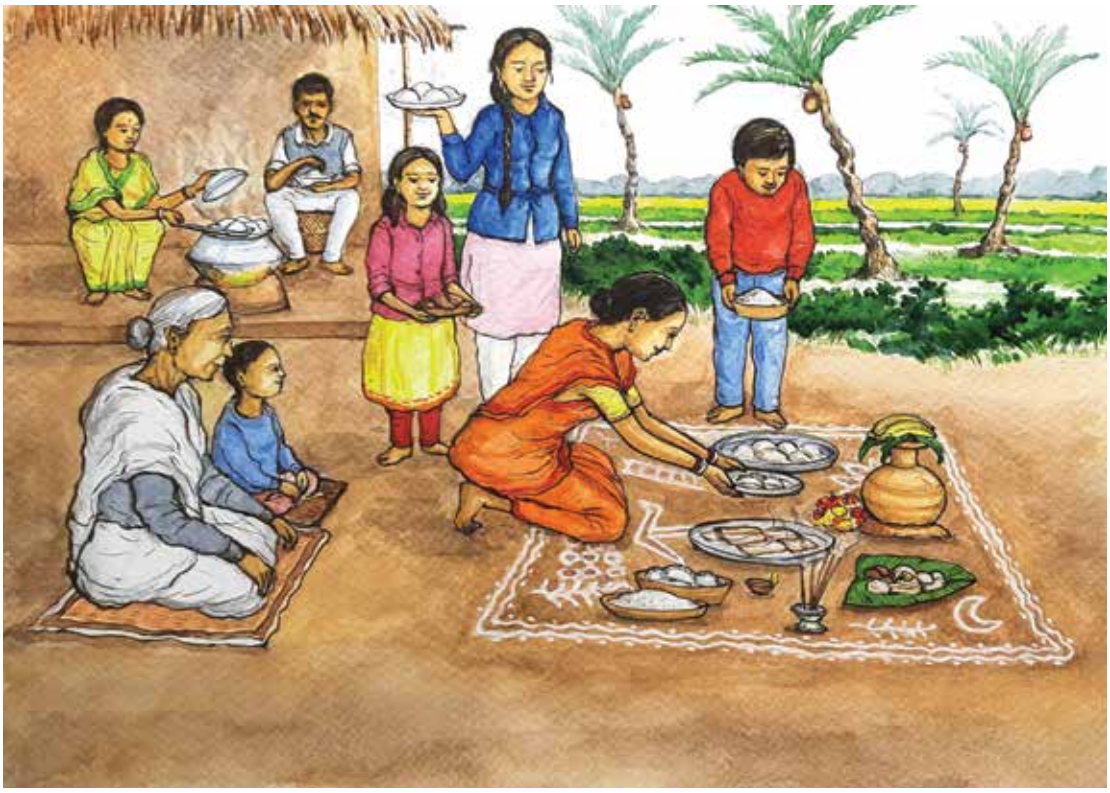

পৌষসংক্রান্তির উৎসব

■ নিচের বাক্যগুলো থেকে শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয় করি।

- গণেশদেবের শরীর হাতির মতো।
- বিদ্যার আলো দিয়ে অবিদ্যার অন্ধকার দূর করেন সরস্বতী দেবী।
- নবান্নে দেবী শ্রীলক্ষ্মীর পূজা করা হয় কারণ তিনি শক্তির দেবী।
- পৌষসংক্রান্তি একটি পার্বণ।
- সকল কাজের পরে গণেশ দেবতাকে স্মরণ বা পূজা শুভকর ও মঙ্গলজনক।

সম্প্রতি পালিত হয়েছে এমন একটি পার্বণে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা নিচের বক্সে লিখি। তারপর সেই অভিজ্ঞতা শ্রেণিতে উপস্থাপন করি।

মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র

■ মন্দির

মন্দির হলো দেবালয়। মন্দিরে দেবদেবীর মূর্তি থাকে। প্রতিদিন মন্দিরে দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করা হয়। সুতরাং যেখানে দেব-দেবীর মূর্তি থাকে এবং পূজা-অর্চনা করা হয় সে স্থানকে মন্দির বলে। সাধারণত দেব-দেবীর নামানুসারে মন্দিরের নামকরণ হয়। যেমন: দুর্গামন্দির, শিবমন্দির, কালীমন্দির, কৃষ্ণমন্দির ইত্যাদি। মন্দির পবিত্র স্থান। মন্দিরে গেলে পুণ্যলাভ হয়। দেহমন পবিত্র হয়। ভক্তরা মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করেন। ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করেন। মনের বাসনা পূর্ণতার জন্য, নিজের ও সকলের শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন। মন্দিরে গিয়ে দেবদেবী দর্শনে অন্তরে ভক্তিভাব উদয় হয়। মনে শান্তি আসে। আমরা সবাই মন্দির বা দেবালয়ে যাব। এখন আমরা একটি মন্দিরের পরিচয় জানব।

■ রমনা কালী মন্দির

আমাদের একটি বিখ্যাত মন্দির হচ্ছে রমনা কালী মন্দির। এটি ঢাকায় অবস্থিত। মন্দিরটি বহু শতাব্দীর প্রাচীন। ১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী রমনা কালীবাড়ি মন্দিরটি ধ্বংস করে দেয়। মন্দিরের সেবায়েতসহ বহু মানুষ হানাদার বাহিনীর আক্রমণে নিহত হয়। মন্দিরের কাছে ছিল আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম। এই আশ্রমটিও ধ্বংস করে দেওয়া হয়। বর্তমান মন্দিরটি আগের জায়গা থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত। নতুনভাবে নান্দনিক করে নির্মিত হয়েছে মন্দিরটি। মন্দিরের সামনে আছে একটি বড় পুকুর।

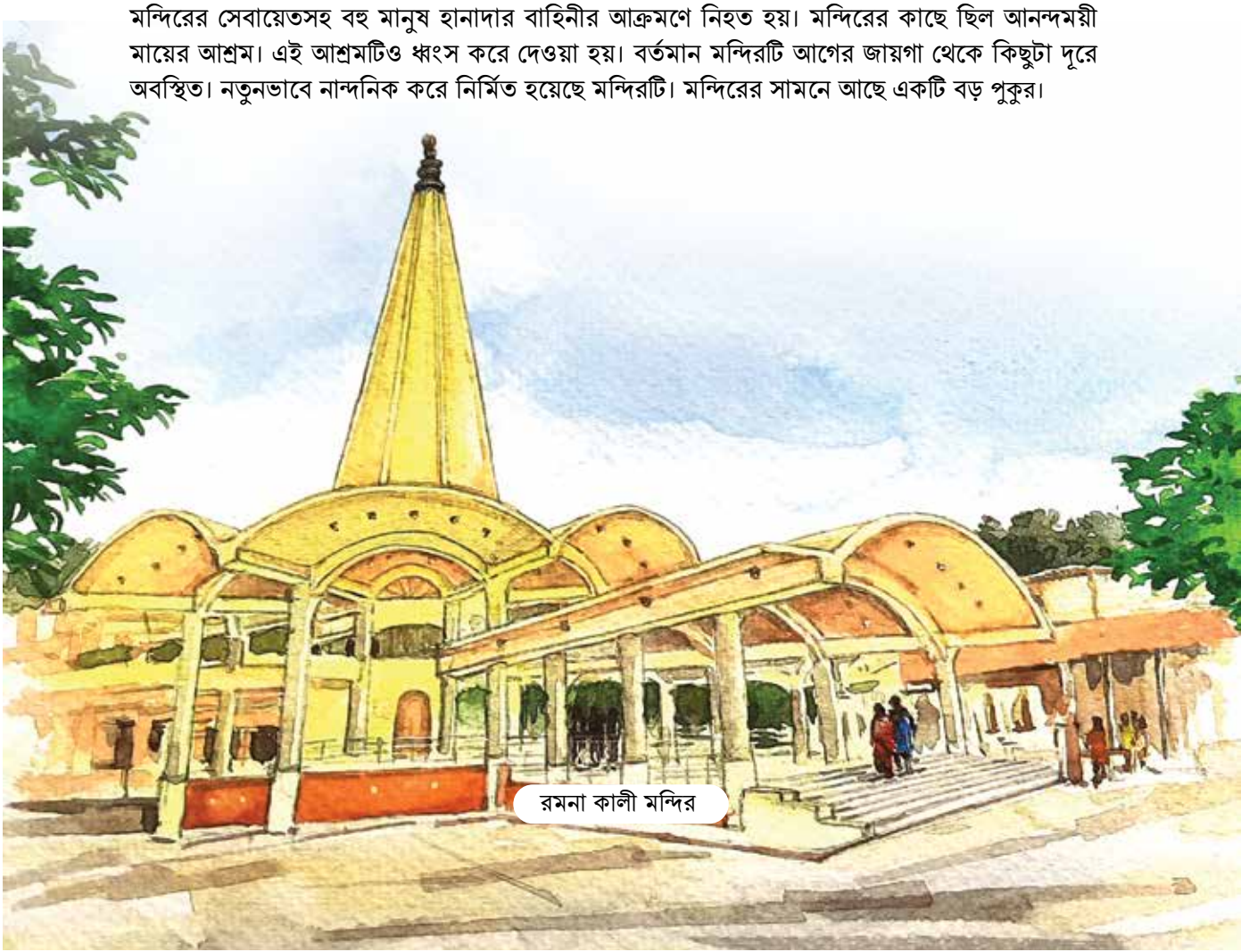

রমনা কালী মন্দির

মন্দির অঙ্গনে রয়েছে মা আনন্দময়ীর আশ্রম। আনন্দময়ী ছিলেন একজন সন্ন্যাসিনী। তিনি আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্না এবং সাধিকা হিসেবে পূজিতা। এখানে কালীমন্দির, দুর্গামন্দির, মা আনন্দময়ীর আশ্রমসহ আরও অনেক মন্দির আছে।

■ তীর্থক্ষেত্র

তীর্থক্ষেত্র হলো দেবদেবী, অবতার কিংবা মহাপুরুষ-মহীয়সীদের নামের সঙ্গে যুক্ত পবিত্র স্থান। তীর্থক্ষেত্রে গেলে মনে ধর্মের ভাব উদয় হয়। দেহমন পবিত্র হয়। পুণ্যলাভ হয়। সকল পাপ দূর হয়। কারও প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ থাকে না।

বাংলাদেশ ও ভারতে অনেক তীর্থস্থান রয়েছে। যেমন: চন্দ্রনাথ ধাম, লাঙ্গালবন্দ, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, পুরী, মথুরা, নবদ্বীপ ইত্যাদি। দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য পুণ্যার্থী এসব পুণ্যভূমিতে তীর্থ করতে আসেন। আমরা এখন একটি তীর্থক্ষেত্র সম্পর্কে জানব।

■ চন্দ্রনাথ ধাম

বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র হচ্ছে চন্দ্রনাথ ধাম। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলায় এ তীর্থক্ষেত্রটি অবস্থিত। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপর একটি শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই তীর্থক্ষেত্র। শিবের এক নাম চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের এই তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করে এখানে আরও অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন শম্ভুনাথ মন্দির, বিরূপাক্ষ মন্দির, ভোলানাথ গিরি সেবাশ্রম, দোল চত্বর, শ্রীকৃষ্ণ মন্দির ইত্যাদি।

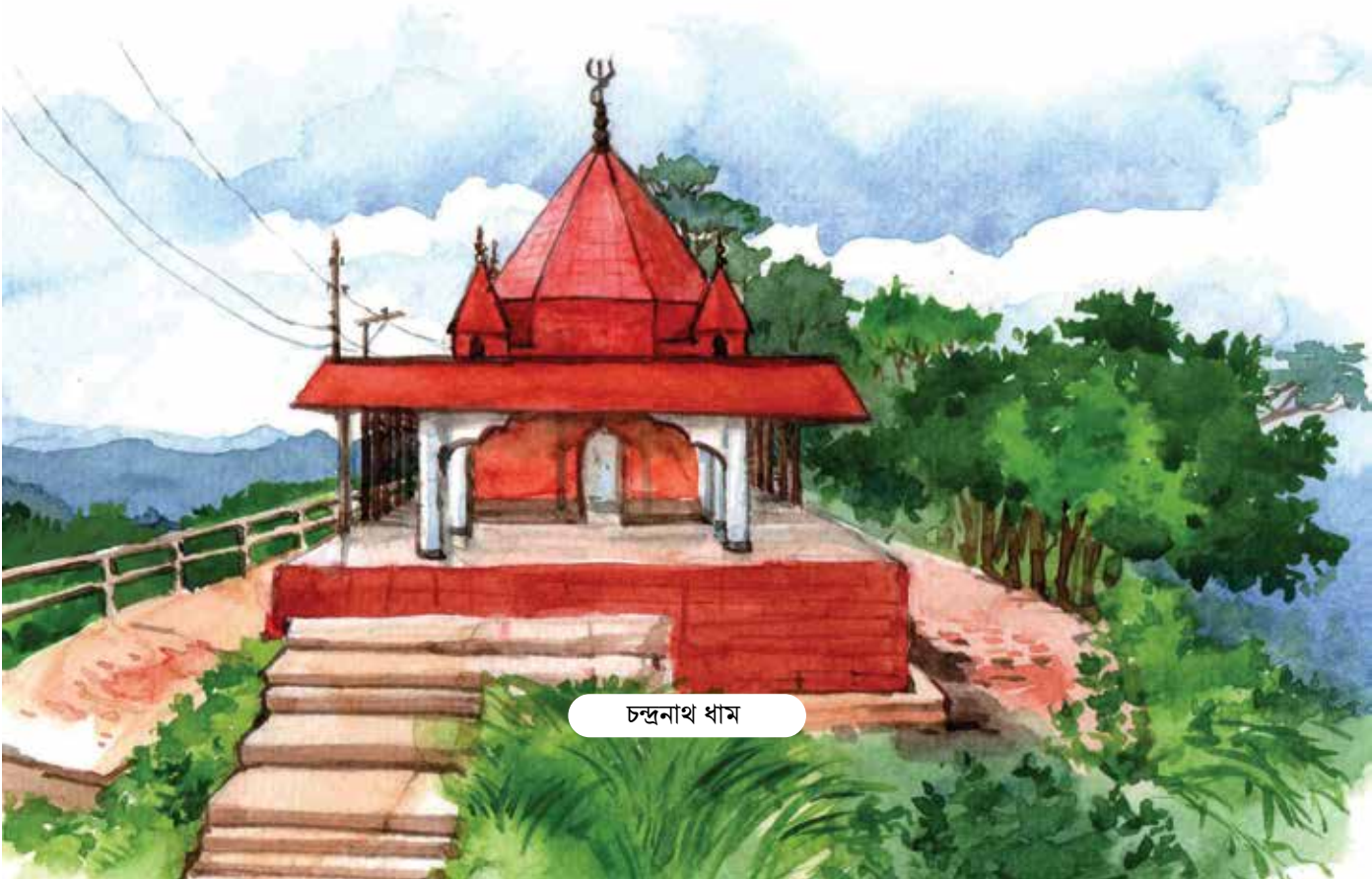

চন্দ্রনাথ ধাম

(পাহাড়ের উপর অবস্থিত চন্দ্রনাথ ধাম। পাহাড়ে ওঠার পথসহ চন্দ্রনাধ ধামের চিত্র)

সীতাকুণ্ডের অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি এ চন্দ্রনাথ ধাম। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথির রাতে চন্দ্রনাথ ধামে ভগবান শিবের আরাধনা করা হয়। শিবের নামের সঙ্গে যুক্ত এই তিথি শিবচতুর্দশী বলে পরিচিত। শিবচতুর্দশী তিথিতে চন্দ্রনাথ ধামে বহু মানুষের সমাগম হয়। এ সময় এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। মেলার আয়োজন করা হয়। দূর-দূরান্ত থেকে অসংখ্য ভক্তের সমাগম ঘটে। চন্দ্রনাথ ধামে গেলে মন শান্ত ও পবিত্র হয়।

এসো, নিচের মিলকরণটি করি। বামদিকের কলামের তথ্যের সাথে ডানদিকের তথ্য মিল করতে হবে। দেখো, একটি মিল করে দেওয়া আছে।

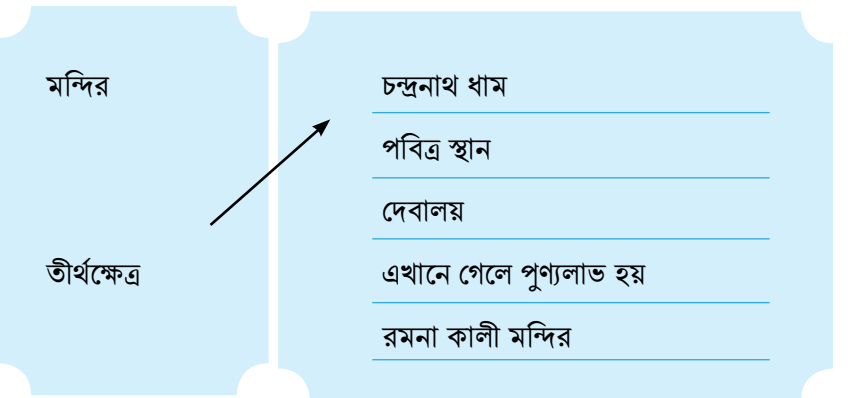

আমরা অনেক সময় মন্দিরে পূজা দিয়ে থাকি, হয়তো মা বাবা অথবা অভিভাবকের সঙ্গে বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র, ধামে যাই। তাদের নিকট থেকে এমন স্থানের বর্ণনা বা তাৎপর্য শুনে থাকি। এবার এরূপ কোনো অভিজ্ঞতা অর্থাৎ কোনো মন্দির, তীর্থস্থান ভ্রমনের অভিজ্ঞতা নিচের বক্সে বর্ণনা করি। এধরনের কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলে অভিভাবকের নিকট শুনে বা বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সংগ্রহ করে তা-ও নিচের বক্সে লিখতে পারি। পরে তা শ্রেণিতে সবার সামনে উপস্থাপন করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যোগাসন

■ উপরের ছবিগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখি এবং ছবিগুলোতে শিব, গৌতম বুদ্ধ এবং স্বামী বিবেকানন্দের বসার ভঙ্গিটি নিচে বর্ণনা করি।

এই যে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকা, এটা এক প্রকার যোগাসন। এসো, এখন আমরা বিভিন্ন রকমের যোগাসন এবং এ যোগাসনগুলো কীভাবে করতে হয় সে সম্বন্ধে আরও জানি।

ঈশ্বর আরাধনার একটি পদ্ধতি হচ্ছে যোগ। সাধারণভাবে 'যোগ' শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর সঙ্গে কিছু যুক্ত করা। তবে ধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে যোগ বলতে বোঝায় ভগবানের প্রতি মনঃসংযোগ করা।

আসন হচ্ছে যোগের একটি অঙ্গ। যোগ অভ্যাস করার জন্য যেভাবে শরীরকে রাখলে শরীর স্থির থাকে অথচ কোনো কষ্টের কারণ ঘটে না, তাকে যোগাসন বলে। যোগাসন অনুশীলনে কতগুলো সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়। তবেই এর সুফল পাওয়া যায়। নিয়মিত যোগাসন অনুশীলনে দেহকে বিভিন্ন রোগ থেকে দূরে রাখা যায়। ফলে শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়ে ওঠে। মন হয়ে ওঠে আনন্দময় ও শান্তিময়। সকল কাজে মনঃসংযোগ ঘটে।

আরাধনার ক্ষেত্রে দেহ এবং মন উভয়েরই গুরুত্ব রয়েছে। দেহকে আশ্রয় করে ধর্মসাধনা অগ্রসর হয়। তাই দেহকে সুস্থ রাখা সাধনার পূর্বশর্ত। আর যোগাসন হচ্ছে দেহ ও মনকে সুস্থ রাখার একটি প্রক্রিয়া। সেজন্য প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিগণ শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার উপায় হিসেবে যোগাসন অনুশীলনের বিধান দিয়ে গেছেন। যোগাসনের সংখ্যা অনেক, যেমন– পদ্মাসন, শবাসন, সিদ্ধাসন, গোমুখাসন, সর্বাঙ্গাসন ইত্যাদি।

প্রতিটি কাজেরই কিছু নিয়ম-কানুন থাকে। ঠিক তেমনি যোগাসন অনুশীলনেরও কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। যেমন–সকাল ও সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট সময়ে যোগাসন অনুশীলন করতে হয়। ভরা পেটে কিংবা একেবারে খালি পেটে আসন অনুশীলন করা অনুচিত। নরম বিছানার ওপর আসন অনুশীলন করা ঠিক নয়। আসন করার সময় ঢিলেঢালা হালকা পোশাক পরা উচিত। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখতে হয়। নিয়ম অনুসারে প্রত্যেকটি আসন অনুশীলন করার পর শবাসনে বিশ্রাম নিতে হয়।

যোগাসনের গুরুত্ব

নিয়মিত যোগাসনে দেহ সুস্থ থাকে। দেহে স্থিরতা আসে। আসন হলো দেহভঙ্গি। এ দেহভঙ্গিতে দেহের প্রতিটি পেশি, স্নায়ু ও গ্রন্থির ব্যায়াম হয়। দেহ-মনের কর্মতৎপরতা ও জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়। দেহের গঠন সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়। দেহের রক্তপ্রবাহ বিশুদ্ধ হয়। দেহের মেদ কমাতে, শীর্ণতা দূর করতে যোগাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যোগাসন দেহের ক্লান্তি দূর করে। মনের চঞ্চলতা দূর করে। যোগাসন অনুশীলনে আধ্যাত্মসাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করা যায়।

বিভিন্ন আসনের মধ্যে আমরা এখন পদ্মাসন ও শবাসন সম্পর্কে বিস্তারিত জানব।

■ পদ্মাসন

আমরা একটি সুন্দর আসনের কথা জানব। এ আসনটি দেখলে মনে হবে যেন একটি পদ্মফুল ফুটে আছে। অর্থাৎ আসনটি দেখতে পদ্মের মতো। তাই এ আসনের নাম পদ্মাসন।

পদ্মাসন

■ পদ্মাসনের নিয়ম

কোনো সমতল স্থানে দুই পা সামনে ছড়িয়ে বসতে হবে। তারপর ডান পা হাঁটুর কাছ থেকে ভেঙে বাম জানুর ওপর রাখতে হবে। আবার বাম পা ভেঙে ডান জানুর ওপর রাখতে হবে। দুই পায়ের গোড়ালি তলপেটের সঙ্গে মিশে থাকবে। দুই হাঁটুও মিশে থাকবে বসার জায়গার সঙ্গে। দেখতে হবে হাঁটু যেন উঁচু না হয়। সোজা হয়ে বসতে হবে। মাথা, ঘাড় এবং মেরুদন্ড সোজা থাকবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। এক মিনিট বসে থাকার পর পা ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর আবার পা পরিবর্তন করে বসতে হবে। অর্থাৎ বাম পা ডান জানুর ওপর রাখতে হবে। এভাবে প্রতিবারে এক মিনিট করে প্রথম দিকে তিন-চারবার অভ্যাস করতে হবে। প্রতিবার অভ্যাসের পর পনের সেকেন্ড শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

■ উপকারিতা

এতে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়। মনঃসংযোগ ও একাগ্রতা বাড়ে। শিক্ষার্থীদের জন্য পদ্মাসন খুবই উপকারী।

■ শবাসন

আমরা একটা মজার আসন শিখব। আসনটির নাম শুনলে একটু অন্যরকম লাগে। কিন্তু চিন্তার কোনো কারণ নেই। আসনটির নাম শবাসন। শব অর্থ মৃতদেহ আসনটিতে শবের মতো হয়ে শুয়ে থাকতে হয়। অর্থাৎ মরার মতো শুয়ে থাকতে হয়। তাই এর নাম শবাসন।

শবাসন

■ শবাসনের নিয়ম

কোনো শক্ত জায়গায় চিত হয়ে শুয়ে পা দুটি লম্বা করে ছড়িয়ে দিতে হবে। পা দুটোর মাঝে এক ফুট থেকে দেড় ফুটের মতো ফাঁক থাকবে। পায়ের গোড়ালি ভিতরের দিকে থাকবে। আঙুলগুলো থাকবে বাইরের দিকে। হাত দুটি লম্বালম্বিভাবে শরীরের দু-পাশে উরু থেকে একটু দূরে রাখতে হবে। হাতের পাতা আধমুঠো অবস্থায় থাকবে। কোনো শক্তভাব যেন না থাকে। এবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করতে হবে। এই আসনটি একসঙ্গে ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর্যন্ত অনুশীলন করতে হয়। আধঘণ্টা হলে আরও ভালো হয়। তবে দৈনিক যোগাভ্যাসে অন্য কোনো আসনের পর এই আসন অন্তত ৫ থেকে ১০ মিনিট পর্যন্ত করা উচিত।

■ উপকারিতা

শবাসন অনুশীলনে শরীরের সব ক্লান্তি দূর হয়। মন শান্ত থাকে। শরীর সুস্থ ও সবল হয়। মাংসপেশি ও স্নায়ু শিথিল হয়। শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভালো হয়। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। অনেক পরিশ্রম ও পড়াশোনার পর শবাসন করলে খুব উপকার হয়।

■ যোগাসনের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম লেখো এবং এগুলোর গুরুত্ব উল্লেখ করো।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানবিক গুণ- নৈতিকতা, মানবিকতা, সহমর্মিতা, দায়িত্বশীলতা

চলো নিচের গল্পটি পড়ি–

অনেক অনেক দিন আগের কথা। রন্তিবর্মা নামে এক প্রজাবৎসল, কৃষ্ণভক্ত রাজা ছিলেন। তাঁর রাজ্যের প্রজাগণ সুখে শান্তিতে বসবাস করতেন। তিনি শুধু রাজা ছিলেন না, ছিলেন রাজার রাজা, মহারাজা, সম্রাট। সম্রাট হয়েও রন্তিবর্মা পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসক্ত ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের চরণকেই তিনি একমাত্র সম্পদ বলে জ্ঞান করতেন। শ্রীকৃষ্ণে সবকিছু সমর্পণ করে তিনি একবার অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করেন। অযাচক বৃত্তি হলো, কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, লোকে ইচ্ছে করে বা দয়া করে যা দেবে, তাই দিয়েই দিনযাপন করতে হবে। অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করার পর একে একে আটচল্লিশ দিন কেটে গেছে। এই আটচল্লিশ দিনে কেউ তাঁকে কিছুই দেয়নি। ফলে তার কিছু খাওয়া হয়নি। উনপঞ্চাশতম দিবসে এক ভক্ত তাঁকে একটি থালায় করে কিছু খাবার দিয়ে গেলেন। তিনি খাবার গ্রহণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এবার তাঁর উপবাস ভঙ্গ হবে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর সামনে একজন ভিক্ষুক উপস্থিত হলেন, সঙ্গে ছিল একটি কুকুর। উভয়ের শরীর খুবই কাহিল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বেশ কিছুদিন কিছুই খাওয়া হয়নি। ভিক্ষুক কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'কদিন ধরে কিছুই খেতে পাইনি, দয়া করে আমাকে কিছু খেতে দিন। আমার সাথে আমার কুকুরটিও না খেয়ে আছে।' 'ক্ষুধার্ত' লোকটির করুণ অবস্থা দেখে রাজা রন্তিবর্মার চোখে জল এলো। কুকুরটি ক্ষুধায় ধুঁকছে। ভিক্ষুক এবং কুকুরের অবস্থার কথা চিন্তা করে রাজার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। তিনি ভুলে গেলেন নিজের অভুক্ত থাকার কথা। তিনি কিছুক্ষণ পূর্বে তার ভক্তের নিকট থেকে যে খাবার পেয়ে ছিলেন তার সবটাই ভিক্ষুক ও তার কুকুরটিকে দিয়ে দিলেন।

খাবার শেষ করে ভিক্ষুক জানালো– 'পেট ভরল না তার'।

রাজা রন্তিবর্মা হাতজোড় করে বললেন, আর তো কিছুই নেই, ভাই। উপরের গল্পের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. নিজে ভীষণ ক্ষুর্ধাত হয়েও রন্তিবর্মা কেন ভিক্ষুককে তাঁর আহার দান করলেন?

২. এখানে রন্তিবর্মার কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে?

৩. মানুষ হিসেবে আমাদেরও এ গুণের অধিকারী হওয়া উচিত কি-না? পক্ষে যুক্তি দাও।

আমরা সমাজে বাস করি। সমাজে ভালো-মন্দ দুই-ই থাকে। কিন্তু আমরা সবাই সব সময় বুঝতে পারি না কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ। অথচ আমাদের ভালো-মন্দ বোঝা খুবই জরুরি। কারণ ভালো কাজ না করলে আমরা ভালো থাকি না। সমাজ ভালো থাকে না। এই ভালো-মন্দ বোঝার জন্য জ্ঞান থাকতে হবে। ভালো-মন্দ বা ভালো কাজ মন্দ কাজ বোঝার জ্ঞানকে বলা হয় নীতি। নীতির সঙ্গে যা যুক্ত হয় তা নৈতিকতা। পরমতসহিষ্ণুতা, মানবিকতা, সহমর্মিতা, দায়িত্বশীলতা এ সবই নৈতিকতার সঙ্গে যুক্ত। হিন্দুধর্ম গ্রন্থসমূহে নৈতিকতা সম্পর্কে অনেক তাত্ত্বিক আলোচনা আছে। এর পাশাপাশি দৃষ্টান্তমূলক অনেক উপাখ্যান আছে। এর মধ্যদিয়ে আমরা নৈতিক শিক্ষা লাভ করতে পারি। এখন আমরা মানবিকতা, সহমর্মিতা ও দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে জানব। আমরা এখানে ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যান থেকে শিক্ষা লাভ করব।

■ স্বামী বিবেকানন্দের মানবিকতা

বিবেকানন্দের জন্ম ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায়। তাঁর পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতার নাম ভুবনেশ্বরী দেবী। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন আমেরিকায় যান তখন তিনি ছিলেন ৩০ বছরের এক যুবক। সেই সময় আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে তিনি যোগদান করেন। এই সম্মেলনে তিনি হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতা প্রশংসিত হয় এবং তিনি শ্রেষ্ঠ বক্তায় পরিণত হন। এই বক্তৃতা তাঁকে বিশ্বজোড়া খ্যাতিমান ব্যক্তিতে পরিণত করে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসেন। কলকাতায় তাঁকে বিশাল সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং দেশে-বিদেশে তাঁর জয়জয়কার পড়ে যায়। বিশ্বজোড়া তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এসব নাম ও খ্যাতির উপরে তাঁর বড় পরিচয় তিনি ছিলেন মানবতাবাদী ও মানবদরদি। তাঁর মানবসেবার কোনো তুলনা হয় না। এখানে তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা থেকে ফিরে এসেই তিনি বহু কাজ হাতে নেন এবং পরিকল্পনা করেন অনেক কাজের। এর মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় সমাবেশে বক্তৃতা দেয়ার জন্য বিদেশ থেকে অনেক আমন্ত্রণ আসছিল। কিন্তু কিছুদিন পর কলকাতায় দেখা দিল প্লেগ রোগের মহামারি। আমরা করোনা মহামারির কথা জানি। করোনার চেয়েও ভয়ঙ্কর ছিল প্লেগ মহামারি । প্লেগে আক্রান্ত হয়ে প্রতিদিন বহু লোকের মৃত্যু হতে লাগল।

শোনা যায়, কলকাতার প্রায় তিন ভাগ লোক মৃত্যুভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। বিবেকানন্দ তাঁর সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিলেন। এখানে কোনো ছোট-বড় নেই। জাতি ধর্ম-বর্ণ নেই। সবাইকে সুস্থ করতে হবে। তাঁর একমাত্র কাজ হলো প্লেগে আক্রান্ত রোগীদের সেবা করা এবং তাদের সুস্থ করে তোলা। তিনি তাঁর অনুগামী সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে সভা করলেন। তাদের বললেন, 'আমরা মরণকে ভয় করে প্লেগ রোগীদের কাছ থেকে দূরে থাকব না। তাদের ঔষধ দিব এবং চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করব।' তিনি বললেন, 'প্রয়োজনে টাকার জন্য আমরা মঠের জমি বিক্রি করব। আমরা আমাদের জীবন দিতেও প্রস্তুত আছি।' ওই সময় রাস্তায় প্রচুর ময়লা জমে গিয়েছিল। মৃত্যুর ভয়ে ময়লা পরিষ্কার করার কাজ যাদের, সেই মেথররাও রাস্তায় নামছিল না। ফলে, ময়লা থেকে রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে পড়ছিল। এমনি এক অবস্থায় রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে ময়লা পরিষ্কার করা খুবই দরকার ছিল। বিবেকানন্দ তাঁর সাধু-সন্ন্যাসী ভাই ও অনুগামীদের নিয়ে রাস্তায় নামলেন। নিজেরা ঝাঁটা হাতে রাস্তা পরিষ্কার করতে লাগলেন। বিবেকানন্দের শিষ্য সিস্টার নিবেদিতাও ঝাঁটা হাতে রাস্তা পরিষ্কারে নেমে ছিলেন। তাদের দেখে মেথররা রাস্তায় নামলেন।

তারা নিয়মিত রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা শুরু করলেন। বিবেকানন্দ প্রচারপত্রে জানালেন এবং সবাইকে বললেন, 'মৃত্যু সকলেরই হবে। কাপুরুষরাই বারবার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। মা আমাদের অভয় দিচ্ছেন। ভয় নাই, ভয় নাই।' বিবেকানন্দ তাঁর অনুগামীদের নিয়ে প্লেগ রোগীদের কাছে গেলেন। তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় অনেক প্লেগ রোগী সুস্থ হলো। অনেকে মৃত্যুপথ থেকে ফিরে এলো। তারপর একসময় কলকাতা প্লেগ রোগ থেকে মুক্ত হলো।

বিবেকানন্দের এই মানবসেবার কোনো তুলনা নেই। তিনি অতি সাধারণ মানুষের সেবা করেছেন। সারাজীবন তিনি সাধারণ মানুষের কথা ভেবেছেন। তাঁর কাছে মানবসেবাই ছিল ঈশ্বরসেবা, ভগবানের সেবা। ভগবানের এক নাম নারায়ণ। তিনি উপাস্য নারায়ণ থেকে মনুষ্য নারায়ণকেই বড় উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এটা মোটেই সহজ কথা নয়। ভগবানের জায়গায় সাধারণ মানুষকে স্থান দিয়ে তাদের সেবা করা সহজ নয়। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'আমার সব থেকে বড় উপাস্য– পাপী নারায়ণ, তাপী নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্র নারায়ণ।'

প্লেগ রোগীর সেবা করছেন স্বামী বিবেকানন্দ ও তার সহযোগীরা

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার বনবাস গমন

■ সহমর্মিতা

আমরা একসঙ্গে বাস করি। কেউ একা থাকি না। একা থাকা যায় না। একজনের দুঃখে আমরা দুঃখী হই। একজনের সুখে সুখি হই। আমাদের সবারই দুঃখ আছে। কারও বেশি। কারও কম। একজন দুঃখীর দুঃখে আমরা তার কাছে যাই। তাকে সান্ত্বনা দিই। সমবেদনা জানাই। এই সান্ত্বনা ও সমবেদনা দেওয়াকে আমরা বলি সহমর্মিতা। এখন সহমর্মিতা সম্পর্কে একটা কাহিনি জানব। অনেক পুরানো সে কাহিনি। রামায়ণে কাহিনিটি বর্ণিত আছে। এবার তাহলে সে কাহিনিটি পড়ব।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের কথা। পিতৃসত্য পালনে রামচন্দ্র বনবাসে যান। একদিন-দুদিনের জন্য নয়। চৌদ্দ বছরের জন্য। রামচন্দ্রের সঙ্গে যান স্ত্রী সীতা। আর ভাই লক্ষ্মণ। রামচন্দ্রের মা কৌশল্যা। কৌশল্যা খুব কান্নাকাটি করছেন। ছেলে, ছেলের বউ চলে যাচ্ছে। দুঃখ হওয়া, কান্নাকাটি করাই তো স্বাভাবিক। তখন সুমিত্রা তাঁকে সান্ত্বনা দিতে আসেন। সুমিত্রা হলেন রামের আরেক মা। রাজা দশরথের অন্য এক স্ত্রী। সুমিত্রার ছেলে লক্ষ্মণ। তিনি যাচ্ছেন রামের সঙ্গে। সুমিত্রার অন্য ছেলে শত্রুঘ্ন। তিনি থাকেন তাঁর বড় ভাই ভরতের সঙ্গে। ভরতের মামা বাড়িতে। ভরত হলেন দশরথের অন্য স্ত্রী কৈকেয়ীর ছেলে। কৌশল্যার মতো সুমিত্রারও অনেক দুঃখ। কিন্তু নিজের দুঃখের কথা তিনি বললেন না। তিনি নানাভাবে কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দেন। সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, লক্ষ্মণ বিপদে-আপদে রামকে রক্ষা করবে। সীতা রামের সেবা করবে। রামের কোনো কষ্ট হবে না। রাম চৌদ্দ বছর পর ফিরে আসবে। তখন আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কৌশল্যার দুঃখ দূর হয়ে গেল।

এভাবে বহু সান্ত্বনার কথা বলেন সুমিত্রা। সুমিত্রার এই সহমর্মিতা, সমবেদনার কোনো তুলনা নেই। আমরা সুমিত্রার কথা মনে রাখব। তাঁকে অনেক শ্রদ্ধা করব। সুমিত্রার সহমর্মিতা আমরা অনুসরণ করব।

তবে এখানে আরও বেশি সহমর্মিতা দেখিয়েছেন লক্ষ্মণ ও সীতা। কারণ তাঁরা রামের সঙ্গে বনে গিয়েছেন। সমভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র বনবাসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। রামচন্দ্রের দুঃখর অবস্থা দেখে লক্ষ্মণের মনে সহমর্মিতা জেগে উঠল। তিনি ভাবলেন, বনবাস জীবনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজপ্রাসাদের রাজসুখ হতে বঞ্চিত হবেন, বৃক্ষতলে শয়ন করবেন, ফলমূল আহার করবেন, বনভূমিতে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হবেন। তাই তিনি রামের সাথে বনবাসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে তিনিও প্রিয় ভ্রাতার সাথে বনবাস জীবনের কষ্ট ভাগ করে নিতে পারেন এবং প্রয়োজনে তাঁকে সহযোগিতা করতে পারেন। সহধর্মিনী সীতার মনেও জেগেছিল সহমর্মিতা। তিনিও রামের অনুগামী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। রামচন্দ্র তাঁকে নানা যুক্তিতে বনবাস জীবনের নানা প্রতিকূলতা ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু সীতা তাঁর কোনো যুক্তি গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন স্বামীর সুখ-দুঃখই তাঁর সুখ-দুঃখ। স্বামী-ভিন্ন রাজ প্রসাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তিনি চান না। রামের বনবাসে যাওয়ার সঙ্গে ভাই লক্ষ্মণ এবং রামের সহধর্মিনী সীতার অনুগামী হওয়া সহমর্মিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

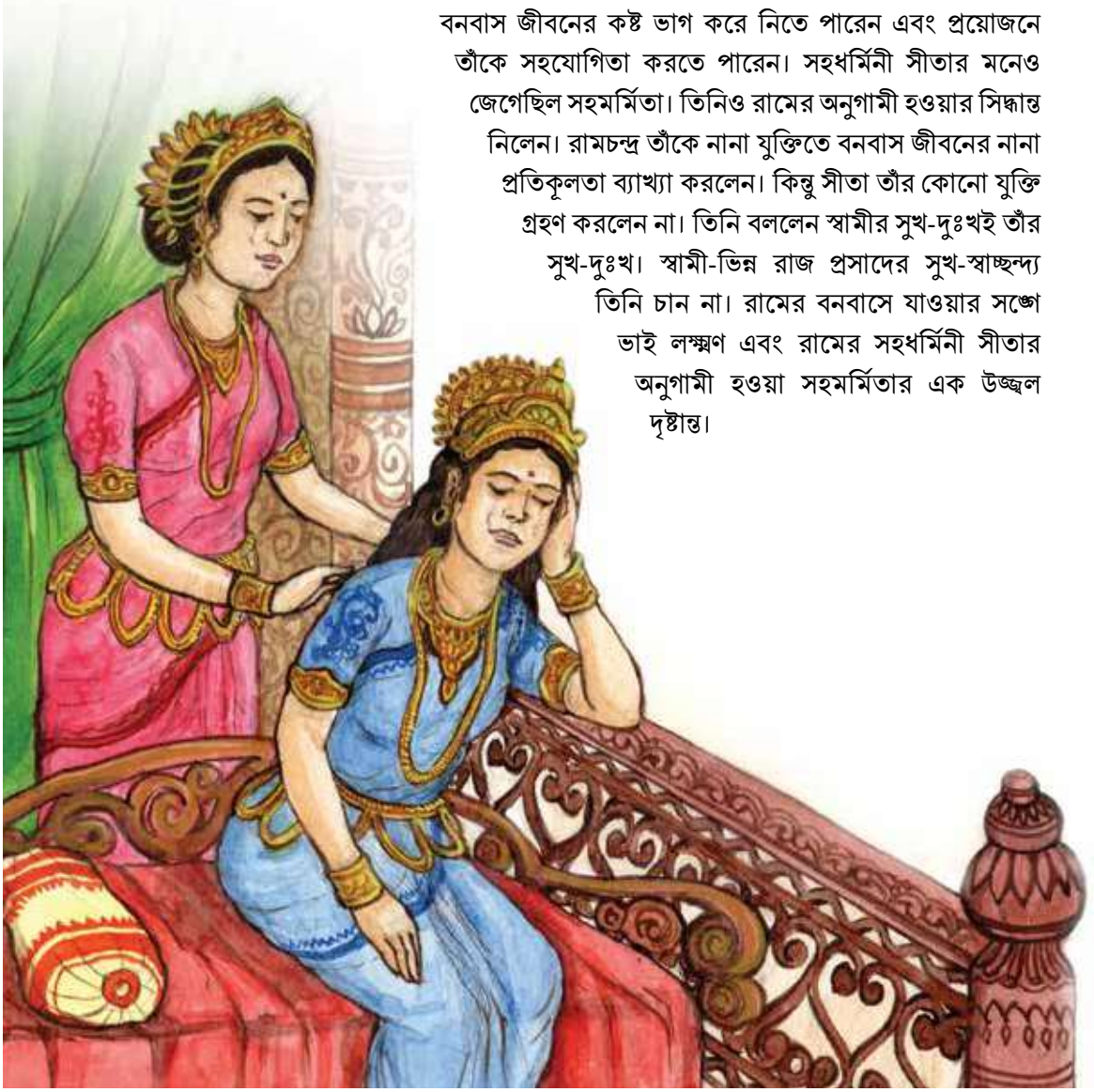

কৌশল্যার প্রতি সুমিত্রা সহমর্মিতা প্রকাশ করছেন

■ দায়িত্বশীলতা

দায়িত্বশীলতা নিয়ে নিচের ছকটি পূরণ করো।

	কয়েকটি দায়িত্বের নাম
১. বাবা-মার প্রতি	
২. শিক্ষকের প্রতি	
৩. প্রতিবেশীর প্রতি	
৪. অসহায় ব্যক্তির প্রতি	

এবার আমরা একজন অসাধারণ চরিত্রের কথা জানব। জানব তাঁর দায়িত্বশীলতার কথা। দায়িত্ব, দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে আমরা জানি। কারও ওপর কিছু করার ভার দেওয়া হয়। এই ভার নেওয়াটাই দায়িত্ব। আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব পালন করা উচিত। এই দায়িত্ব পালন করার বিষয়টি হলো দায়িত্বশীলতা। আমরা এখন একজন অসাধারণ দায়িত্বশীল মানুষের কথা জানব। তিনি হলেন ভরত।

আমরা রামায়ণের কথা জানি। রামায়ণের একজন রাজার নাম দশরথ। তিনি অযোধ্যার রাজা ছিলেন। দশরথের তিন স্ত্রী। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। তিন স্ত্রীর চার ছেলে। কৌশল্যার ছেলে পুত্র রামচন্দ্র। কৈকেয়ীর পুত্র ভরত। আর সুমিত্রার দুই পুত্র লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

রাম ভাইদের মধ্যে বড়। দশরথ বড় ছেলে রামচন্দ্রকে সিংহাসনে বসানোর আয়োজন করলেন। কিন্তু এতে কৈকেয়ী বাধা দিলেন। তিনি বললেন, তার ছেলে ভরতকে সিংহাসনে বসাতে হবে। এক সময় দশরথ কৈকেয়ীকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন। কৈকেয়ী সেই দুটি বর চাইলেন। এক বরে ভরত রাজা হবে। আরেক বরে রামচন্দ্র চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যাবেন। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনে বনে চলে গেলেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী সীতা গেলেন। ভাই লক্ষ্মণও গেলেন। ছেলের শোকে-দুঃখে রাজা দশরথের মৃত্যু হলো। এসব ঘটনার কিছুই জানতেন না ভরত। তিনি তখন তাঁর মামাবাড়িতে ছিলেন। শত্রুঘ্নও ছিলেন ভরতের সঙ্গে।

ভরতকে সব সংবাদ দেওয়া হলো। তিনি ফিরে এলেন অযোধ্যায়। সব কথা শুনলেন। মায়ের ওপর তাঁর খুব রাগ হলো। খুব কষ্ট পেলেন। তিনি রাজা হতে চাইলেন না। বড় ভাই রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনতে বনে গেলেন। কিন্তু রামচন্দ্র শত অনুরোধেও ফিরলেন না।

রামের পাদুকা সিংহাসনে রেখে ভরতের রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন

তখন ভরত রামচন্দ্রের কাছে তাঁর দুটি পাদুকা চাইলেন। তিনি বললেন, এই পাদুকা সিংহাসনে থাকবে। রামচন্দ্রের পক্ষে সেবক হিসেবে তিনি রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন।

ভরত চৌদ্দ বছর রাজা ছিলেন। কিন্তু তিনি নামেই রাজা ছিলেন। রামচন্দ্রই ছিলেন প্রকৃত রাজা। রামচন্দ্রের পক্ষে তিনি রাজার দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র। চৌদ্দ বছর ভরত কোনো রাজভোগ গ্রহণ করেননি। সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করেছেন। রামচন্দ্র বনবাসে ছিলেন। বনে বনে ঘুরে কষ্ট পেয়েছেন। ভরত সে কথা স্মরণ করেছেন। রাজবাড়িতে রাজা হয়েও তিনি বনবাসীর মতো থেকেছেন। কিন্তু এই চৌদ্দ বছর তিনি রাজ্যের অনেক উন্নতি করেছেন। রাজ্যের প্রজারা সুখি ছিল। চৌদ্দ বছর পর রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এলেন। ভরত রামচন্দ্রকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। বড় ভাইয়ের প্রতি ভরতের এই শ্রদ্ধা-ভালোবাসার তুলনা হয় না। তুলনা নেই তাঁর দায়িত্বশীলতারও। সবচেয়ে বড় কথা ভরত একটি রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন এবং সে দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেলেন।

দায়িত্বপালন ও দায়িত্বশীলতার জন্য ভরত একজন আদর্শ মানুষ। তিনি অসাধারণ মানুষ। দায়িত্বশীলতার জন্য ভরত চিরস্মরণীয়। চির অনুসরণীয়। ভরতের আদর্শকে আমরা স্মরণ করব। ভরতকে আমরা অনুসরণ করব। আমাদের ওপর যদি কখনও কোনো দায়িত্ব এসে পড়ে আমাদের তা পালন করতে হবে। দায়িত্ব পালনে আমরা যেন কখনও ভীত না হই, ব্যর্থ না হই।

- চলো, নিচের মিলকরণটি করি। বামদিকের কলামের তথ্যের সাথে ডানদিকের তথ্য মিল করতে হবে। দেখো, একটি মিল করে দেওয়া আছে।

নৈতিকতা	কারও বিপদে সাহায্য করা
মানবিকতা	অন্যের বিপদে পাশে থাকা
সহমর্মিতা	অন্যের অশান্তি কামনা করা
দায়িত্বশীলতা	ভালো কাজ করা
	কথা দিয়ে কথা রাখা

এবার তোমার জীবনে এরকম কোনো ঘটনা থাকলে বা কখনও এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তুমি কী করতে পারো তার বর্ণনা নিচে লেখো।

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আদর্শ জীবনচরিত

■ চলো একটি ছোট নাটিকা করি। নিচে নাটিকার সংলাপগুলো লেখা আছে।

কালিন্দী হ্রদে কালীয়নাগ নামে এক বিষধর সাপ বাস করত। তার বিষে ঐ হ্রদের জল বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল। ঐ জল পান করে সেখানকার জীবজন্তুসহ অনেকেই মারা যায়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গোপবালক বন্ধুদের সঙ্গে ঐ হ্রদের পাড়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে খেলা করছিল। কৃষ্ণের কয়েকজন তৃষ্ণার্ত বন্ধু ঐ হ্রদের জল পান করল এবং তৎক্ষণাৎ মারা গেল। সকলে এ দৃশ্য দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং এর কারণ খুঁজতে লাগল। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ সেখানে এলেন।

শ্রীকৃষ্ণ : কী হয়েছে এখানে? আমাকে বলো।

প্রথম গোপবালক বন্ধু : কেন তুমি জানো না! কালিন্দী হ্রদে একটি ভয়ঙ্কর সাপ এসেছে। হ্রদের সব জল বিষাক্ত করে ফেলেছে। হ্রদের অনেক মাছ মরে যাচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ : বলো কী!

শ্রীকৃষ্ণের কালীয়নাগ দমন

দ্বিতীয় গোপবালক বন্ধু : শুধু কি তাই! ঐ জল পান করে আমাদের কয়েকজন বন্ধু মারা গেছে।

তৃতীয় গোপবালক বন্ধু : এলাকার বহু জীবজন্তুও মারা গেছে। (সবাই কান্নাকাটি করতে লাগল)

চতুর্থ গোপবালক বন্ধু : আমরা এখন পানীয় জল পাব কোথায়?

শ্রীকৃষ্ণ	:	চিন্তা করো না, সাপটিকে আমি এখনই তাড়িয়ে দিচ্ছি।
গোপবালক বন্ধুরা (সমস্বরে)	:	তুমি যেয়ো না বন্ধু! ও ভয়ঙ্কর সাপ।
শ্রীকৃষ্ণ	:	তোমরা আমার জন্য ভেবো না। ভয় পেয়ো না। আমার কিছু হবে না।

গোপবালকদের সাথে এলাকাবাসীরাও আশার আলো দেখতে পেল।

এলাকাবাসীকে রক্ষা করতে শ্রীকৃষ্ণ সাহসিকতার সাথে লড়াই করে সাপটিকে দুর্বল করে ফেলেন। সাপটি ছিল মূলত কালীয়নাগ। শ্রীকৃষ্ণ কালীয়নাগকে হ্রদ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। বিষাক্ত সাপ থেকে রক্ষা পেল এলাকাবাসী। তারা প্রাণে বেঁচে গেল। সকলে শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করতে লাগলেন।

নাটিকাটিতে অভিনয় করে নিশ্চয়ই তোমরা অনেক আনন্দ পেয়েছ। এখানে আমরা দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে গোপবালক বন্ধুসহ এলাকাবাসীর জীবন বাঁচাতে এগিয়ে এসেছেন।

- আমার ভালো লাগে এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তা করে নিচের ঘরগুলো পূরণ করি।

ভালোলাগা ব্যক্তির নাম	ভালোলাগার কারণ

- এবার বিষয়টি শ্রেণিতে উপস্থাপন করি এবং অন্যের মতের আলোকে তা আলোচনা করি।

আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সব সময় সকলের মঙ্গলের কথা বলেন। এঁরা সকলকে ভালোবাসেন। নিজের কথা বেশি ভাবেন না। এই মানুষদের আমরা আদর্শ মানুষ বলে থাকি। এঁদের জীবনচরিত আমাদের জন্য অনুসরণীয়। আদর্শ মানুষের জীবনচরিত আলোচনা করলে, তাঁদের অনুসরণ করলে আমরাও ভালো মানুষ হতে পারি। এই আদর্শ মানুষদের মধ্যে অনেকে অলৌকিক গুণসম্পন্ন হন। এবার আমরা এরকম কয়েকটি আদর্শ জীবনচরিত সম্পর্কে জানব।

■ শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত অতুলনীয়। শৈশব থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি বহু কাজ করেছেন। অসীম তাঁর কার্যাবলি। এখানে কেবল তাঁর শৈশবকালের কিছু কথা আমরা জানব।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল মথুরায়। শ্রীকৃষ্ণের পিতার নাম বসুদেব। মাতা দেবকী। দেবকী ছিলেন মথুরার রাজা কংসের জ্ঞাতিভগিনী। কংসের খুড়তুতো বোন। কংস খুবই অত্যাচারী ছিলেন। এত অত্যাচারী ছিলেন যে নিজের বাবা উগ্রসেনকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেন। তাঁকে কারাগারে আটকে রাখেন আর নিজে রাজা হন।

কংস দৈববাণী থেকে জানতে পেরেছিলেন, দেবকীর অষ্টম সন্তান তাঁকে হত্যা করবে। একথা জেনে তিনি বসুদেব-দেবকীর ওপরও অত্যাচার শুরু করেন। তাঁদের দুজনকে তিনি কারাগারে আটকে রাখেন। একে একে তিনি বসুদেব-দেবকীর ছয় সন্তানকে হত্যা করেন। বসুদেবের আরেক স্ত্রী ছিলেন। তাঁর নাম রোহিনী। রোহিনীর গর্ভে জন্ম হয় বলরামের। রোহিনী এবং বলরাম থাকতেন গোকুলে বসুদেবের বন্ধু নন্দরাজের আশ্রয়ে। বলরাম গোকুলে নন্দরাজার ঘরে বড় হতে থাকেন। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে বসুদেব-দেবকীর অষ্টম সন্তান শ্রীকৃষ্ণ জন্মলাভ করেন। তাঁর জন্মের কারণে এই তিথিটি জন্মাষ্টমী নামে পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় রাত্রে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব কংসের হাত থেকে নিজে সন্তানকে রক্ষা করার জন্য ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে মথুরার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রমত্তা যমুনা নদী পাড়ি দিয়ে গোকুলে যান। সেখানে নন্দরাজার গৃহে প্রবেশ করেন।

সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন নন্দের স্ত্রী যশোদা জন্ম দিয়েছেন একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের। বসুদেব কৃষ্ণকে যশোদার পাশে রেখে তাদের কন্যা সন্তানকে নিয়ে পুনরায় মথুরায় ফিরে আসেন। যশোদা-নন্দরাজের কন্যা সন্তানকে রেখে দেন দেবকীর পাশে। এসব ঘটনা কেউ জানতে পারেনি। পরদিন সকালে কংস দেবকীকে দেখতে যান। তিনি গিয়ে দেখেন দেবকী কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। কংস দেবকীর কোল থেকে সদ্যোজাত সন্তানকে কেড়ে নিয়ে পাথরের ওপর ছুঁড়ে মারেন। কিন্তু মেয়েটি মরল না, বরং মেয়েটি ওপরে উঠে গেল। আর বলে গেল, 'কংস, তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে'। আসলে মেয়েটি ছিল দেবী মহামায়া।
এ কথা শুনে কংস বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি মথুরা এবং গোকুলের সব শিশুকে মারার পরিকল্পনা করলেন। তিনি তার অনুচরদের ছদ্মবেশে পাঠালেন গোকুলে। এই অনুচররা অসুর ও রাক্ষস শ্রেণির। এদের অলৌকিক শক্তি আছে। নানা রূপ ধারণ করতে পারে এরা। অনেক শিশু তাদের হাতে মারা গেল।

কৃষ্ণ এখন তাঁর পালক পিতা-মাতা নন্দ-যশোদার সন্তান। সেখানেই তিনি একটু একটু করে বড় হচ্ছেন। একদিন কৃষ্ণ একটি শকটের নিচে শুয়ে ছিলেন। মা যশোদা তখন একটু দূরে ছিলেন। মাকে না পেয়ে কৃষ্ণ হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে লাগলেন। শক্তিমান শিশু কৃষ্ণের পায়ের আঘাতে শকটটি ভেঙে গেল। সকলের বিশ্বাস শকটের মধ্যে এক অসুর লুকিয়ে ছিল। শকটের সঙ্গে সেই অসুর মরে গেল।

বানরকে দধি খাওয়াচ্ছেন বালক শ্রীকৃষ্ণ

আর একদিন পুতনা নামে এক রাক্ষসী এলো। সে খুব সুন্দরী হয়ে এসেছিল। যশোদার কাছ থেকে কৃষ্ণকে সে চেয়ে নিল। কৃষ্ণকে আদর করতে লাগল। তারপর একটু দূরে গিয়ে বুকের দুধ খেতে দিল। আসল ব্যাপার হলো, পুতনা তার স্তনে বিষ মাখিয়ে রেখেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, বিষমাখানো এই স্তন পান করে কৃষ্ণ মরে যাবে। কিন্তু কৃষ্ণ এমনভাবে দুধ পান করলেন যে পুতনা চিৎকার করতে লাগল। চোখ বেরিয়ে এলো তার। অনেক দূরে গিয়ে সে পড়ে মরে গেল।

এরপর একদিন তৃণাবর্ত নামে এক অসুর এলো। সে প্রচন্ড ধূলিঝড় দিয়ে কৃষ্ণকে উড়িয়ে নিল। কিন্তু কৃষ্ণ ওপরে গিয়ে তৃণাবর্তের গলা জোরে জড়িয়ে ধরল। কৃষ্ণের প্রচন্ড চাপে মরে গেল তৃণাবর্ত।

এভাবে কৃষ্ণ তাঁর শিশুবেলাতেই অনেক দুষ্ট অসুর-রাক্ষসদের মেরেছেন। তাদের মেরে নিজেকে রক্ষা করেছেন। গোকুলের শিশুদেরও রক্ষা করেছেন। এই বয়সে তিনি জীবসেবাও করেছেন। জীবের প্রতি তাঁর অনেক ভালোবাসা ছিল। তিনি ঘর থেকে ঘি-মাখন-দই প্রভৃতি এনে বানরদের খাওয়াতেন। তিনি এই বয়সে মানুষের সেবাও করেছেন। এক বৃদ্ধা ফল বিক্রি করতেন। চলাফেরায় তাঁর খুব কষ্ট হতো। কৃষ্ণ ঘর থেকে টাকা-পয়সা এনে তাঁকে দিয়ে দিতেন। এভাবে তিনি একজন গরিব বৃদ্ধাকে সাহায্য করেছেন।

এক সময় তিনি বড় ভাই বলরামকে নিয়ে মথুরায় যান। সেখানে তিনি অত্যাচারী কংসকে হত্যা করেন। উগ্রসেন এবং তাঁর বাবা-মাকে কারাগার থেকে উদ্ধার করেন। এ সবকিছুই হয় তাঁর কিশোর বয়সের মধ্যে।

শিশুবয়সে কৃষ্ণ খুব দুরন্ত ছিলেন। শক্তিশালী ছিলেন। সমবয়সী বালকের তুলনায় তিনি দীর্ঘ ছিলেন। অনেক বুদ্ধি ছিল তাঁর। বড় হয়ে কৃষ্ণ সমাজসংস্কার করেন। ধর্মসংস্কার করেন। রাজনীতির আদর্শ স্থাপন করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি অর্জুনের রথের সারথি ছিলেন। তাঁর মুখেই শোনা গেছে গীতার অমৃত বাণী।

শ্রীকৃষ্ণ আমাদের আদর্শ। তিনি ভগবানের আসনে আসীন। তবে তিনি মানুষ হিসেবেই সকল আদর্শ স্থাপন করেন। আমরা তাঁর আদর্শ জীবনচরিত আলোচনা করব। আমরা সমৃদ্ধ হব। শক্তি পাব। আদর্শ মানুষ হওয়ার প্রেরণা পাব।

শ্রীকৃষ্ণের দুটি কর্মকাণ্ডের নাম উল্লেখ করো এবং এর ফলে মানুষ বা সমাজ কীভাবে উপকৃত হয়েছিল তা লেখো।

■ লোকনাথ ব্রহ্মচারী

লোকনাথ ব্রহ্মচারী একজন মহাপুরুষ। ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার চাকলা নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রামকানাই চক্রবর্তী। মাতা কমলা দেবী। রামকানাই

বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম

চক্রবর্তীর ইচ্ছা ছিল, তাঁর পুত্রদের মধ্যে একজন ব্রহ্মচারী হবেন। লোকনাথ পিতার ইচ্ছা পূরণ করেন। আচার্য ভগবান গাঙ্গুলীর কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ভগবান গাঙ্গুলীর দীক্ষিত শিষ্য হলেন। তাঁর প্রিয় বন্ধু বেণীমাধবও ভগবান গাঙ্গুলীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। একদিন তাঁরা গৃহত্যাগ করেন। গুরুর তত্ত্বাবধানে তাঁরা কঠোর সাধনায় রত হন। কালীঘাট, কাশীধাম ও হিমালয় পর্বতে তাঁরা কঠোর সাধনা করেন। এভাবে তাঁদের পঁচিশ বছর কেটে যায়। এরপর তাঁরা দেশ পরিভ্রমণে বের হন। তাঁরা আফগানিস্তান, মক্কা, মদিনা ও চীন দেশ ভ্রমণ করেন।

এরপর আবার হিমালয়ে সাধনার জন্য চলে আসেন। একসময় গুরুর নির্দেশে দুই বন্ধু আলাদা হয়ে গেলেন। বেণীমাধব ভারতের কামাখ্যা মন্দিরে গেলেন। বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দিতে এলেন লোকনাথ ব্রহ্মচারী। এখান থেকেই শুরু হলো তাঁর মানবসেবা। একদিন এক বটগাছের নিচে লোকনাথ ব্রহ্মচারী ধ্যান করছিলেন। এমন সময় ডেঙ্গু কর্মকার নামে এক দরিদ্র লোক সেখানে আসেন। তাঁর পা জড়িয়ে ধরলেন। তিনি ফৌজদারি মামলার আসামী। মামলার বিচারে তার কঠিন শাস্তি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এই মহাবিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে অনেক অনুনয় করেন। লোকনাথের কৃপায় মামলা থেকে তিনি মুক্তি পান। পরবর্তীকালে ডেঙ্গু কর্মকার তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

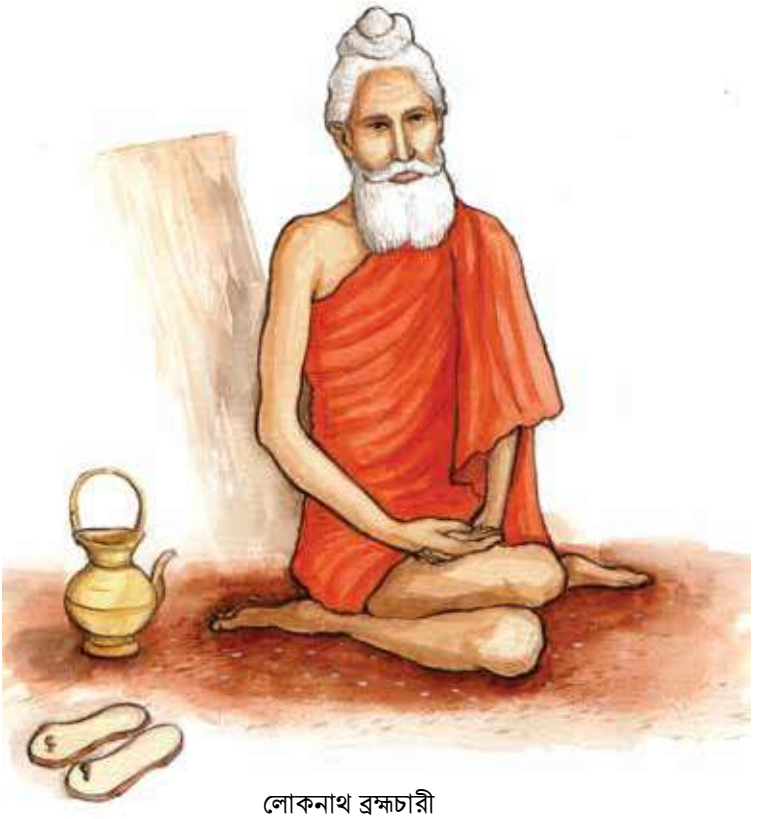

লোকনাথ ব্রহ্মচারী

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি লোকনাথের সঙ্গে ছিলেন। লোকনাথ ব্রহ্মচারী ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর স্পর্শে অনেক অসুস্থ মানুষ সুস্থ হয়ে যেত। বিপদ থেকে উদ্ধার পেত। একবার বারদীর পাশের গ্রামে এক ভয়ঙ্কর ছোঁয়াচে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সব মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। লোকনাথ তাদের পালাতে নিষেধ করলেন। তাঁর কৃপায় ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্তরা সুস্থ হয়ে ওঠে। এতে তাঁর প্রতি মানুষের বিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। এভাবে লোকনাথ, 'বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। দেশ-বিদেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তু এবং পশুপাখিকেও সমানভাবে ভালোবাসতেন। নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার বারদী গ্রামে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম। সেখানে অনেক পশুপাখি থাকত। তিনি নিজের হাতে তাদের খাবার দিতেন। পরিচর্যা করতেন। পাখিরা নির্ভয়ে তাঁর শরীরে এসে বসত। তিনি সকল জীবের মধ্যেই ব্রহ্মের উপস্থিতি অনুভব করতেন। জীবের কল্যাণ করে যে আনন্দ পাওয়া যায় সেটাই ছিল তাঁর কাছে ব্রহ্মানন্দ । বাবা লোকনাথ ছিলেন একজন আদর্শ মহাপুরুষ। তাঁর মধ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ কোনো ভেদাভেদ ছিল না। সমাজের সবাইকে তিনি সমান চোখে দেখতেন। এজন্য সবার কাছে তিনি পরম পূজনীয় এবং শ্রদ্ধেয় ছিলেন। জীবসেবাই যে ঈশ্বরের সেবা তিনি তা অনুভব করতেন। এজন্যই তিনি সব সময় নিজেকে জীবের সেবায় নিয়োজিত রাখতেন। জীবসেবার বিষয়টি তিনি শিষ্যদেরকেও বোঝাতেন। মহাপুরুষ লোকনাথ ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ১৬০ বছর বয়সে বারদীর আশ্রমে পরলোকগমন করেন। বর্তমানে বারদী একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেত্র।

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর তিনটি বাণী:

১. সত্যের মতো পবিত্র আর কিছুই নেই। সত্যই স্বর্গ গমনের একমাত্র সোপানস্বরূপ, সন্দেহ নেই।

২. যে ব্যক্তি সকলের সুহৃদ, আর যিনি কায়মনোবাক্য সকলের কল্যাণ সাধন করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী।

৩. চাঁদ ও সূর্যের মধ্যে যেমন কোনো তুলনা হয় না, ঠিক তেমনি তোমার জীবনটাকেও অন্যের সাথে তুলনা করো না। যার যখন সময় আসবে সে তখনই জ্বলে উঠবে।

পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত তিনটি বাণীর বাহিরে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আরও দুটি বাণী ও সেগুলোর তাৎপর্য নিচের বক্সে লেখো।

■ রানি রাসমণি

দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির

রানি রাসমণি ছিলেন একজন মহীয়সী নারী। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে রানি রাসমণির জন্ম। কলকাতার হালিশহরের নিকট কোনা নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস। মাতার নাম রামপ্রিয়া দাসী। হরেকৃষ্ণ দাসের পেশা ছিল গৃহনির্মাণ ও কৃষিকাজ। জন্মের পর মা রামপ্রিয়া মেয়ের নাম রাখেন রানি। পরে তাঁর নাম হয় রাসমণি। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিয়ে হয়। জমিদার রাজচন্দ্র দাস ছিলেন তাঁর স্বামী। গরিব ঘরে তাঁর জন্ম। কিন্তু বিয়ের পর তিনি সাধারণ মানুষের কাছে রানির পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁদের চারটি কন্যাসন্তান ছিল— পদ্মমণি, কুমারী, করুণা এবং জগদম্বা।

রাজচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত কর্মকুশল এবং উদার প্রকৃতির মানুষ। তাঁর ব্যবহার ছিল অমায়িক। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্ত্রী রাসমণির অনুপ্রেরণা। এই জমিদার পরিবার অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেছে। তাঁরা অনেক অসহায় পরিবারকে সাহায্য করেছেন। রাজচন্দ্র ও রাসমণির দাম্পত্য জীবন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মাত্র ৪৯ বছর বয়সে রাজচন্দ্র মৃত্যুবরণ করেন। ফলে জমিদারির সমস্ত দায়িত্ব রাসমণির ওপর এসে পড়ে।

রাসমণি অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন। সেসবের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো পুরীর জগন্নাথ ক্ষেত্রের সংস্কার সাধন। একবার তিনি পুণ্যভূমি জগন্নাথ তীর্থে যান। সেখানকার রাস্তাঘাট ছিল খুবই জরাজীর্ণ। তীর্থযাত্রীদের চলাফেরা করতে খুব কষ্ট হতো। রাসমণি সমস্ত রাস্তা সংস্কার করে দেন। তিনি তিন দেবতার জন্য তিনটি মুকুটও তৈরি করে দেন। তিন দেবতা হলেন— জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। মুকুট তিনটি ছিল হীরকখচিত। মুকুট তৈরিতে লেগেছিল ষাট হাজার টাকা।

রানি রাসমণি

রাসমণি খুব তেজস্বীও ছিলেন। একবার ইংরেজ সরকার গঙ্গায় মাছ ধরার জন্য জেলেদের ওপর কর আরোপ করে। জেলেদের কর দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না। জেলেরা খুব অসহায় হয়ে পড়ে। তারা মমতাময়ী রানি রাসমণির কাছে যায়। রাসমণি টাকা দিয়ে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে গঙ্গার লিজ নেন। গঙ্গার ঐ অংশটি তখন রাসমণির অধিকারে আসে। রাসমণি গঙ্গায় ইংরেজদের জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেন। ইংরেজরা তখন বাধ্য হয় রাসমণির সঙ্গে আপস-মীমাংসা করতে। জেলেরা কর ছাড়াই মাছ ধরার অধিকার পায়।

রানি রাসমণির উল্লেখযোগ্য অবদান হলো দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির নির্মাণ। মানুষের বিশ্বাস, তিনি মা কালীর আদেশ পেয়েছিলেন। তিনি গঙ্গার তীরে জমি ক্রয় করে কালীমন্দির নির্মাণ করেন। রানি সেখানে প্রতিদিন পূজা দিতেন। এক সময় গদাধর নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ মন্দিরের পুরোহিতের দায়িত্ব পান। তিনিই পরবর্তীকালে হন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। রামকৃষ্ণের বিখ্যাত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে রানি রাসমণির মৃত্যু হয়। সাধারণ পরিবারে তাঁর জন্ম কিন্তু কর্মের দ্বারা তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। কর্মই শ্রেষ্ঠ– রানি রাসমণির জীবনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই।

■ শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা চন্দ্রমণি দেবী। তাঁর বাল্যনাম ছিল গদাধর। বাল্যকালে গদাধর দেখতে খুবই সুন্দর এবং সদাপ্রসন্ন ছিলেন। লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগ ছিল না তবে প্রকৃতিকে খুবই ভালোবাসতেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করত। ভজন-কীর্তনের প্রতি তাঁর খুব আকর্ষণ ছিল। লোকমুখে শুনে শুনে তিনি বৈদিক স্তব-স্তোত্র এবং রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি আয়ত্ত করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

পিতার মৃত্যুর পর গদাধরের জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। জীবনের প্রতি অনেকটা উদাসীন হয়ে কখনও নির্জনে, কখনও বা শ্মশানে গিয়ে বসে থাকতেন। এ অবস্থা দেখে তাঁর অগ্রজ রামকুমার তাঁকে কলকাতা নিয়ে যান। রামকুমার ছিলেন রানি রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের পুরোহিত। সেখানে গদাধর প্রায়ই মায়ের মন্দিরে ভাবতন্ময় হয়ে থাকেন। মাঝে মধ্যে আবার আত্মমগ্ন অবস্থায় গঙ্গাতীরে ঘুরে বেড়াতেন।

রামকুমারের মৃত্যুর পর গদাধর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে মায়ের পূজার ভার গ্রহণ করেন। এখানেই তাঁর সাধন জীবনের শুরু। তিনি মনেপ্রাণে মায়ের পূজায় মনোনিবেশ করেন। পূজা করতে তিনি প্রায়ই ভাবে অচেতন হয়ে পড়তেন। 'মা', 'মা' বলে আকুল হয়ে যেতেন। তাঁর আকুল আহ্বানে একদিন মা কালী জ্যোতির্ময়ী রূপে তাঁর কাছে আবির্ভূত হন।

মায়ের দেখা পেয়ে ভাবের আবেশে তিনি উন্মাদের ন্যায় আচরণ শুরু করেন। এ খবর পেয়ে মাতা চন্দ্রমণি তাঁকে বাড়ি নিয়ে যান এবং রাম মুখুজ্যের মেয়ে সারদাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। মায়ের ধারণা, বিয়ের পর তিনি সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে যাবেন।

বিয়ের কিছুদিন পর সারদাদেবীকে গ্রামে রেখে গদাধর পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। কারণ সংসারের প্রতি তাঁর কোনো মোহ ছিল না। এ সময় তিনি বিভিন্ন যোগীপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করেন। এর মধ্যে সন্ন্যাসী তোতাপুরী তাঁকে বেদান্ত সাধনায় দীক্ষিত করেন এবং তাঁর নাম রাখেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সাধনপথ শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক প্রভৃতি মতে সাধনা করেন। এমনকি ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্মমতেও সাধনা করেন। সব ক্ষেত্রেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি বলেন, "নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করলে সব পথেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়।" তিনি মনে করতেন 'যত মত তত পথ'। অর্থাৎ পথ বহু হলেও লক্ষ্য এক -- ঈশ্বর লাভ ।

রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা

শ্রীরামকৃষ্ণের এই সাধনা ও তাঁর পরমতসহিষ্ণুতার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে অনেক জ্ঞানী-গুণী দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে আসতে লাগলেন। তিনি তাঁদের গল্পের মাধ্যমে অনেক জটিল তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতেন। একদিন এলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি সরাসরি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?' উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয় দেখেছি, এই তোকে যেমন দেখছি। তোকেও দেখাতে পারি, দেখবি?' নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় ঈশ্বর দর্শন করে ধন্য হলেন এবং তাঁর চরণে নিজেকে সমর্পণ করলেন। এই নরেন্দ্রনাথই হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ সারদা দেবীকেও মাতৃজ্ঞানে পূজা করতেন এবং সব সময় মা বলেই সম্বোধন করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হবে। ঈশ্বরজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে। পিতা, মাতা এবং জন্মভূমিকে শ্রদ্ধা করতে হবে। সকল ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু হতে হবে। তাহলে আর ধর্মীয় সংঘাত দেখা দেবে না। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকলে সম্প্রীতি বজায় থাকবে। আমরা সকলে শ্রীরামকৃষ্ণের এই জীবনাদর্শ অনুসরণ করব।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট এই মহাপুরুষ পরলোকগমন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিনটি বাণী:

১. ধর্ম সম্পর্কে কথা বলা খুব সহজ, কিন্তু সেটা অনুশীলনে আনা ততটাই কঠিন।

২. ভালোবাসার মাধ্যমে ত্যাগ এবং বিবেক স্বাভাবিক ভাবেই প্রাপ্ত হয়েই যায়।

৩. ভগবানের ভক্তি বা প্রেম ছাড়া কোনো কাজকে সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়।

আমরা দুইজন মহাপুরুষ ও একজন মহীয়সী নারীর জীবনী পড়লাম। আমরা জানলাম, দেশ ও মানুষের কল্যাণের জন্য তাঁরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁদের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরাও আমাদের সাধ্যমতো মানুষের দুঃখ কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করব। এরই অংশ হিসেবে আমরা বিনিময় স্টলের কথা ভাবতে পারি। আমাদের অনেকের বাড়িতে অনেক জিনিস থাকে যা ব্যবহারযোগ্য। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় মনে করে ফেলে দিই। এ জিনিসগুলোই আবার অনেকের প্রয়োজনে লাগতে পারে। এসব জিনিস আমরা বিনিময় স্টলে রাখতে পারি। যাদের প্রয়োজন তারা এটা ব্যবহার করবে। ব্যবহারের পর ভালো থাকলে আবার বিনিময় স্টেলে রেখে যাবে। এভাবে আমরা বিনিময় স্টলের মধ্য দিয়ে অনেকের উপকার করতে পারি। তবে বাড়ি থেকে কিছু নিতে গেলে পরিবারের বড়দের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। তাদের অনুমতি নিতে হবে।

বিনিময় স্টল

■ উপরে বিনিময় স্টলের ছবি দেখতে পাচ্ছি। এরকম একটি বিনিময় স্টলে কী কী জিনিস থাকতে পারে তার একটি তালিকা করি।

- বিনিময় স্টল পরিচালনা এবং জিনিসপত্র আদান-প্রদানের কী কী নিয়ম-কানুন থাকতে পারে সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করি।

এখানে উল্লিখিত মহাপুরুষদের দুটি করে বাণী সংগ্রহ করি এবং তা প্লাকার্ড আকারে লিখে শিক্ষকের নিকট জমা দিই।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সহাবস্থান

- চলো একটি সেবাদানমূলক কার্যক্রম দেখে আসি। এখানে কী ধরনের সেবা দেওয়া হচ্ছে, কারা সেবা নিতে আসছে তা পর্যবেক্ষণ করি।
- এখন যা যা তুমি দেখলে তা নিচে লিখে ফেলো। শিক্ষককে তোমার লেখা দেখাও।

- শিক্ষক তোমাদের সেবাদান কার্যক্রম দেখার অভিজ্ঞতার আলোকে নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবতে বলবেন:
  - তোমরা এই সেবাদান কার্যক্রমে কী কী দেখেছ?
  - এখানে কি সবাই সেবা পাচ্ছে?
  - এখানে কোন বিষয়টি তোমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে?
- এবার পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া দেবদাস চক্রবর্তীর আঁকা মুক্তিযুদ্ধের পোস্টারটি দেখ।
- এবার বাড়িতে/এলাকায় তোমার পরিচিত কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে নিচের প্রশ্নগুলোর সাপেক্ষে উত্তর লিখে নিয়ে আসবে।
  - দাদু/দিদিমা বা অন্য কোনো সম্বোধন, তুমি কেন যুদ্ধে গিয়েছিলে?
  - ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, তরুণ-বৃদ্ধ— তোমরা সবাই যুদ্ধে গিয়েছিলে?
  - তখন কি সব ধর্মের মানুষেরা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলে?

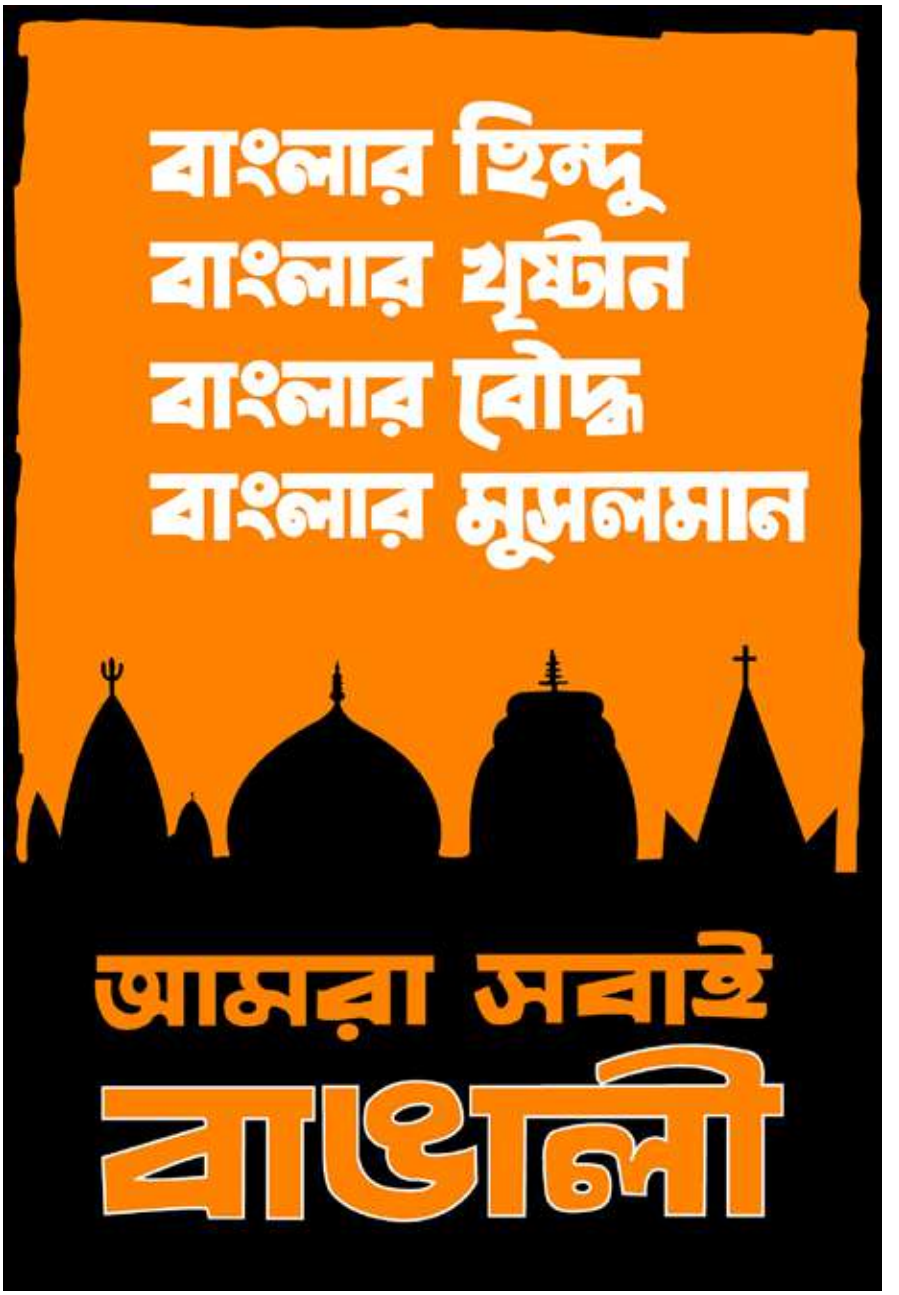

দেবদাস চক্রবর্তীর আঁকা পোস্টার

- সাক্ষাৎকারটি তুমি লিখিত আকারে পরবর্তী সেশনে জমা দেবে।
- সেবাদান কার্যক্রম বিষয়ে তোমার যে অভিজ্ঞতা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কথোপকথন এবং এই যে পোস্টারটি তুমি দেখলে, এর পরিপ্রেক্ষিতে তোমার অনুভূতি দলগতভাবে আলোচনা সাপেক্ষে উপস্থাপন করো।

- সবার উপস্থাপন শুনে এবং তোমার উপলব্ধি মিলিয়ে দেবদাস চক্রবর্তীর আঁকা পোস্টারটির আলোকে নিজে নিজে নিচের বক্সে একটি পোস্টার এঁকে ফেলো।

■ এই যে তোমরা একটি সেবাদান কার্যক্রম দেখলে, মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কথা বললে, নিজেরা একটি পোস্টার বানালে – এর মূল ভাবনা হচ্ছে আমরা সবাই বাংলাদেশি এবং আমরা বিপদে-আপদে সুখে-দুঃখে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সবার পাশে দাঁড়াই। প্রত্যেকটি ধর্মেই কিন্তু অন্যকে সাহায্যের, অন্যের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলা আছে। পরস্পরের প্রতি এই যে আমাদের অবস্থান, এবার এ সম্পর্কে আমাদের হিন্দুধর্মের মূল গ্রন্থসমূহে এবং আমাদের মহাত্মা-মহাপুরুষেরা কী কী বলেছেন তা জেনে নিই।

■ হিন্দুধর্মে সহাবস্থান

সকল ধর্মের মানুষের সাথে সম্প্রীতি নিয়ে বসবাস হিন্দুধর্মের প্রধান ভাবনাগুলোর একটি। হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ গীতায় ফলের আশা না করে সকলের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। হিন্দুধর্মে সৃষ্টির সকল মানুষের মঙ্গলের জন্য ভালোবাসা নিয়ে দায়িত্ব পালন করে যেতে বলা হয়েছে।

হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মানুষের কল্যাণ, অপরের সাথে সম্প্রীতি নিয়ে সহাবস্থানের বিষয়ে চমৎকার কিছু বাণী আছে। স্বামী অরুণানন্দ সম্পাদিত 'পরম পবিত্র বেদসার সংগ্রহ' থেকে কয়েকটি বাণী নিচে দেওয়া হলো:

মনুষ্যের মধ্যে কেহ বড় নয় বা কেহ ছোট নয়। ইহারা ভাই ভাই।

(ঋগ্বেদ, ৫/৬০/৫)

হে জ্যোতিঃস্বরূপ! তুমি মানবসমাজের শক্তিপুঞ্জের সহিত অবস্থান কর এবং তুমিই যজমানের কর্মফল প্রদান কর। তুমি সকলেরই হিতকারী বন্ধু।

(সামবেদ পূর্বাচিক, ১/১/২)

হে দুঃখনাশক পরমাত্মন্। আমাকে সুখের সহিত বর্দ্ধন কর। সব প্রাণী আমাকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখুক। আমি সব প্রাণীকে যেন মিত্রের দৃষ্টিতে দেখি। আমরা একে অন্যকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখিব।

(যজুর্বেদ, ৩৬/১৮)

■ গীতা এবং বেদের আলোকে সহাবস্থান বলতে তুমি কী বুঝ সে বিষয়ে নিজস্ব মতামত নিচের ঘরে লেখো। প্রয়োজনে তোমার প্রতিবেশী বা বন্ধুর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করতে পার।

হিন্দুধর্মের বিভিন্ন যুগের মহাত্মা-মহাপুরুষেরা এই সম্প্রীতিরই জয়গান গেয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস অন্য ধর্মের আরাধনা পদ্ধতিকেও গভীরভাবে জানার চেষ্টা করেন। রামকৃষ্ণের মতে এই বিভিন্ন ধর্মের সাধনা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করারই নামান্তর। তিনি বলেছিলেন সকল ধর্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা, বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন পথে হাঁটলেও সকল ধর্মই স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করতে চায়। তাঁর বিখ্যাত বাণী হলো, 'সকল ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ', অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের মত ও পথ ভিন্ন হলেও তাদের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য এক বা অভিন্ন।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোয় বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় বলেছিলেন, "I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration but we accept all religions as true." যা বাংলায় লিখলে দাঁড়ায় এরকম: "আমি গর্বিত যে আমি এমন একটি ধর্মের যা বিশ্বকে সহনশীলতা এবং সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা শিখিয়েছে। আমরা কেবল সর্বজনীন সহনশীলতায় বিশ্বাস করি না, আমরা সকল ধর্মকেই সত্য বলে মেনে নিই।"

১৮১২ সালে অবিভক্ত ভারতবর্ষের গোপালগঞ্জে জন্মগ্রহণ করা হরিচাঁদ ঠাকুর হিন্দুধর্মে সম্প্রীতি-সহাবস্থানের আর একটি উজ্জ্বল নাম। তিনি মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন। হরিনামে যারা মাতোয়ারা তারা মতুয়া নামে পরিচিত।মতুয়াদের প্রচলিত মত পথকে বলা হয় মতুয়াবাদ। মতুয়াবাদ সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা এই তিনটি মূল স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ মতবাদে সকল মানুষ সমান; জাতিভেদ বা সম্প্রদায়ভেদ মতুয়াবাদে স্বীকৃত নয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর হিন্দু-মুসলিম ঐক্য গড়েছিলেন। এখন অবধি সেই ঐক্যের আলোয় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে বিভিন্ন এলাকায় যে মেলার আয়োজন হয় তাতে অংশগ্রহণ করে এবং উৎসবে মেতে ওঠে।

হরিচাঁদ ঠাকুর যে বারোটি উপদেশ সকলের জন্য রেখে গিয়েছেন তা 'দ্বাদশ আজ্ঞা' নামে পরিচিত। এই দ্বাদশ আজ্ঞার পঞ্চম আজ্ঞায় হরিচাঁদ ঠাকুর বলেছেন, 'সকল ধর্মের প্রতি উদার থাকবে।' আর ষষ্ঠ আজ্ঞায় বলেছেন, 'জাতিভেদ করবে না।'

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংঘজননী সারদা দেবীও সহাবস্থানের তাৎপর্য মনে করিয়ে দিয়েছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তাঁর বলা শেষ বাণী ছিল, "যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপন করে নিতে শেখো। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।"

■ এখন নিচের বক্সে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, হরিচাঁদ ঠাকুর, এবং সারদা দেবীর ছবি আঁকতে চেষ্টা করো এবং সহাবস্থান নিয়ে তাদের একটি করে বানী লিখ।

■ নিচের ছকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, হরিচাঁদ ঠাকুর, এবং সারদা দেবীর সহাবস্থান বিষয়ক মূল ভাবনাগুলো লিখে ফেলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস	
স্বামী বিবেকানন্দ	
হরিচাঁদ ঠাকুর	
সারদা দেবী	

হিন্দুধর্মের প্রধান গ্রন্থসমূহ এবং মহাত্মা-মহাপুরুষদের বাণী থেকে আমরা বুঝতে পারি হিন্দুধর্ম মানুষে মানুষে একসাথে সশ্রদ্ধ ভালোবাসা নিয়ে সহাবস্থানের কথা বলে। হিন্দুধর্ম দল-মত নির্বিশেষে সবার কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার কথা বলে। অন্যান্য ধর্মেও এই সহাবস্থানের কথা বারবার বলা হয়েছে। তোমার শিক্ষক এবং বন্ধুদের কাছ থেকে তুমি আরও অনেক কিছু জানতে পারবে।

■ প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসব

■ হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মীয় উৎসবসমূহ কী কী নিশ্চয়ই তোমরা জানো। তোমরা কি অন্যান্য ধর্মের প্রধান প্রধান উৎসবের কথা জানো? কখনও অংশগ্রহণ করেছ সে সব উৎসবে? চলো নিচে একটি তালিকা দেখি যেখানে অন্যান্য ধর্মের প্রধান প্রধান উৎসবের কথা বলা আছে।

ইসলাম ধর্ম	বৌদ্ধধর্ম	খ্রীষ্টধর্ম
প্রধান ধর্মীয় উৎসব		
ইদ– ইদুল ফিত্‌র এবং ইদুল আজহা	বুদ্ধ পূর্ণিমা (বৈশাখী পূর্ণিমা)	ক্রিসমাস
সকলের মঙ্গল কামনা করা হয়। সবাই সুন্দর জামা পরে মজার মজার খাবার খায়, বন্ধু-প্রতিবেশী-আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যায়।	সকলের মঙ্গল কামনা করা হয়। সবাই সুন্দর জামা পরে মজার মজার খাবার খায়, বন্ধু-প্রতিবেশী-আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যায়।	সকলের মঙ্গল কামনা করা হয়। সবাই সুন্দর জামা পরে মজার মজার খাবার খায়, বন্ধু-প্রতিবেশী-আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যায়।

■ লক্ষ করো, তুমি যেমন দুর্গাপূজায় নতুন জামা পরো, মজার মজার খাবার খাও, প্রতিবেশী-বন্ধুদের বাড়িতে বেড়াতে যাও, ঠিক তেমনি অন্য ধর্মের বন্ধুরাও তাদের উৎসবের দিন একই কাজগুলো করে। আসলে কী জানো, সকল ধর্মের উৎসবের আনন্দের মধ্যে দারুণ মিল আছে।

■ তুমি সহাবস্থান সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছ। এবার প্রস্তুতি নাও পরবর্তী সেশনে তোমার এই ধারণা তুমি কীভাবে অন্য একটি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবে।

ফ্লাইওভার : উন্নয়নের পথে, পথ চলি একসাথে

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এসেছে বিপুল পরিবর্তন। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে শেখ হাসিনা সরকার সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নে যুগান্তকারী বিভিন্ন পদক্ষেপ/উদ্যোগ নিয়েছে, যার সুফল আমরা ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা), মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার, মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোডে মো. জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার, কুড়িল ফ্লাইওভার, বনানী ফ্লাইওভার, মগবাজার- মৌচাক ফ্লাইওভার, চট্টগ্রামের আখতারুজ্জামান ফ্লাইওভার, কালশি ফ্লাইওভার, হাতির ঝিল প্রকল্প, চার লেনবিশিষ্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, বিআরটি প্রকল্প, এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে প্রকল্পসহ দেশব্যাপী অসংখ্য ফ্লাইওভার ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সড়ক, মহাসড়ক ও নগরীকে যানজটমুক্ত করার পাশাপাশি সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
৬ষ্ঠ শ্রেণি
হিন্দুধর্ম শিক্ষা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন– দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য